রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র

অমরেন্দ্র দাস

Scanned with CamScanner

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

৮৯১.৪৪৫
অ.দা.(র)
BG219

Scanned with CamScanner

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No. ....
Date..........

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র

৮৯১·৪৪৫
অ-দা(র)

অমরেশ দাশ

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No. 10781A
Date

P.S.V. LIBRARY, SRINIKETAN
VISVA-BHARATI
ACCESSION NO.- BG 219

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৯৪

প্রকাশক
অমরেশ দাশ
কালনা
বর্ধমান

প্রচ্ছদপট
ধৃতব্রত দাশ

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিন্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬।

কুড়ি টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গ্রন্থ প্রকাশ· অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

উৎসর্গ

চিন্মোহন সেহানবীশের

স্মৃতির উদ্দেশে

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রস্তাবনা । ১

পটভূমি । ১০

বৃত্তান্ত । ৫২

সংহতি ও সমর্থন । ১৪৭

বিরোধ ও বিরোধিতা । ১৬৪

উপসংহার । ১৮৬

নির্দেশিকা । ১৯৩

Scanned with CamScanner

লেখকের অন্য বই

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন

অত্যাবশ্যক সংশোধন

৭৮ পৃষ্ঠায় '১৯৫২' হবে ১৯২৫ ; ৯৩ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনে 'জন্য' হবে অন্য ; ৯৭ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে 'তার' হবে আর।

Scanned with CamScanner

AREA LIBRARY
Acc. No.....................
Date.........................

ভূমিকা

১. প্রাসঙ্গিক।

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মন্তব্য করেন ১৮৯১ সালে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে বিষয়টি তাঁকে যেমন ভাবিয়ে তুলেছিল, তেমনি তিনি নিজে থেকেও ভেবেছেন কখনো কখনো। তাঁর সেই বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তাকে একত্র ক'রে দেখতে চেয়েছি এই বইতে। এ-বিষয়ে তিনি যে খুব গভীরভাবে ও বিস্তৃতভাবে ভেবেছিলেন তা নয়, তবে সন্দেহ নেই, যতটুকু ভেবেছিলেন তার পরিমাণ অল্প হলেও অল্প নয় মূল্য। সে-মূল্য দ্বিমাত্রিক। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখে নিতে পারি এক অনভ্যস্ত কিন্তু অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিতে। তাতে তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি, মানবপ্রেম ও মানবতাবাদ, প্রগতিশীলতা ও উত্তরণশীলতা—এক কথায় তাঁর মহত্ত্বকে যেমন পাই, তেমনি পাই তাঁর আত্মবিরোধ ও আত্মদ্রোহ। দ্বিতীয়ত, যখন দেখি একদা সমাজতন্ত্রের উপর যে আলোকপাত তিনি করেছিলেন তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে একালের অনেক অভিজ্ঞতা, তখন, তাঁর কিছু উদ্ঘাটনকে মনে হয় অমোঘ। ভাবা যেত এই মিল কাকতলীয় যদি দেখতাম এর মূলে যুক্তি নেই, নেই ইতিহাসের সম্বোধি, কিংবা নেই মানুষের দুর্দশায় হৃদয়ের ক্ষরণ ও মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিমগ্ন মনন। কিন্তু এ-সমস্তই যেহেতু নিঃসংশয়ভাবে উপস্থিত সেহেতু ঐসব উদ্ঘাটনকে অবজ্ঞা করার অর্থ নির্বুদ্ধিতা।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, সমাজতন্ত্র হল একালের মোক্ষতত্ত্ব এবং মানুষের ইতিহাসের রথ সেদিকেই চলেছে অবধারিতভাবে। এক নিদারুণ বিশ্বগত উৎকণ্ঠার তাড়নায় তিনি ঐ উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। সে-ইতিহাসও তাই যথাযোগ্যভাবে সংকলন করতে হল এখানে।

বলা যদিও বাহুল্য, তবু বলে রাখা ভালো যে, এখানে যা আলোচ্য তথা বিচার্য তা রবীন্দ্রনাথের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। এই ভগ্নাংশ মহিমময় হলেও ভগ্নাংশই; অতএব একে গ্রহণ করতে হবে সমগ্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে।

২. আনুষঙ্গিক।

সকল রচনার মতো এর পিছনেও আছে অনেকের আনুকূল্য ও অপ্রত্যক্ষ অবদান। অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এই রচনার যখন উপক্রম হচ্ছিল তখন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের অবেক্ষক শ্রীসনৎকুমার বাগচী এবং গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তাতে অভিভূত হয়েছি। স্বনামধন্য সাংবাদিক

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দেখতে পেয়েছি সেই খাতাগুলি যাতে রাশিয়া থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় চিঠির অবিকল অনুলিপি রক্ষা ক'রে গিয়েছেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। পত্রযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন ডঃ ভবতোষ দত্ত। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আর এই বইকে উপলক্ষ করে আমার জীবনে যিনি অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন তিনি হলেন শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, সকলের 'চিনুদা'। পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দিয়েছিলাম তাঁকে। ক্লান্তিহীন অসুস্থতা সত্ত্বেও সাগ্রহে তিনি সেটি পড়েছিলেন—একবার নয়, দুবার। তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিত এক লেখকের এই রচনাটির মুদ্রণের জন্য তিনি যে রকম উৎসাহী ও তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তা দেখে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছি। মুদ্রণের কাজ যখন চলছিল তখনই হঠাৎ চলে গেলেন তিনি। এই যাওয়া একটিমাত্র মানুষের চলে যাওয়া নয়—তার থেকে বেশি, তার থেকে ব্যাপক। একটি রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট এক নেতা হয়েও চিন্মোহন ছিলেন যথার্থই মুক্তমনা—এবং সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা এই দুর্ভাগা দেশে দ্রুত দুর্লভ হয়ে যাচ্ছেন, যাঁদের চরিত্র-চিন্তা-রুচি ভিন্ন এক গরীয়ান যুগের সম্পদ। কী ঐকান্তিক নিষ্ঠায়ই না তিনি আজীবন রবীন্দ্রনাথ ও মার্ক্স—এই দুই পরম মূল্যকে পোষণ ও প্রচার ক'রে গিয়েছেন! তাই স্বতই ইচ্ছা হয়, এই বই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একটি প্রণাম হয়ে উঠুক।

এর প্রকাশ যে অবশেষে সম্ভব হ'ল এজন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং আমার দুই শিক্ষক শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু ও শ্রীঅরুণকুমার বসুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছেও নানা কারণে আমি কৃতজ্ঞ। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

আর একটি নিবেদন—এই বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, শাস্ত্রমতে এখনও যে সাবালক হয়ে ওঠে নি।

'জননী'
লালবাগান
কালনা, বর্ধমান।

অমরেশ দাশ

AREA LIBRARY
Acc. No.............
Date...............

প্রস্তাবনা

সমাজতন্ত্র বলতে আমরা বুঝবো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। কারণ, রবীন্দ্রনাথের এতদ্বিষয়ক ভাবনার যা-কিছু বিকাশ তা সোভিয়েত রাশিয়াকে উপলক্ষ ক'রে এবং তার সংস্পর্শে এসে। আরো একটি কথা গোড়াতেই ব'লে নেওয়া দরকার। সমাজতন্ত্র বিষয়ে তাঁর অধিকাংশ বিচার ও মন্তব্য ঐ দেশকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ ক'রে। বস্তুত এক্ষেত্রে একটি দেশ ও একটি তত্ত্ব একাকার হয়ে গেছে। তত্ত্বালোচনায় এই সমীকরণ সমীচীন নয় নিশ্চয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নিছক তত্ত্বগতভাবে কবি বিষয়টিকে দেখেন নি।

রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্বগত আগ্রহ ও অনুশীলনের সংবাদ কিংবা প্রামাণিক কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই—যদিও এ-বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল সোভিয়েত রাশিয়া যাবার অনেক আগে থেকেই। ঐ কৌতূহল যদি কৌতূহলমাত্র থাকত তবে এ-আলোচনার প্রয়োজন হত না। কিন্তু তা থাকে নি। একদিকে অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে মুক্ত মন ও বুদ্ধির প্রভাবে ঐ কৌতূহল কালক্রমে পরিণত হয়েছিল উৎসাহে ও আগ্রহে, প্রশ্নে ও প্রত্যাশায়। সূচনায় যে দৃষ্টি ছিল তটস্থ, অন্তিমে তা হয়ে উঠেছিল অনেকাংশে তদ্গত। আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, সমাজতন্ত্রের সংস্পর্শে এসে তিনি নির্বিকার ও নিস্পৃহ থাকতে পারেন নি। উদারচিত্তে তাকে বিচার করেছেন ; গ্রহণ যেমন করেছেন কিছু, তেমনি প্রত্যাখ্যানও।

তত্ত্বগত জিজ্ঞাসা থেকে রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রে আকৃষ্ট হন নি। সেকালের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতো, সূচনায় তাঁরও মনে ছিল ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে বিশ্বাস। তাঁর নিজের কথায়—

"তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু

র. স. ১

অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।"[১]

কিন্তু অভিজ্ঞতার প্রহারে প্রহারে সে-বিশ্বাস একদিন জীর্ণ হয়ে গেল—

"প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছেন, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।"[২]

ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপের সত্য পরিচয় তিনি পেলেন; স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিরোধ, একের পর আর একটি বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত হতে দেখলেন মানবিক মূল্যবোধ। তখন শূন্য হয়ে গেল তাঁর সেই বিশ্বাসের সম্বল। মৃত্যুর তিন মাস আগে বললেন—

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"[৩]

তাঁর এক বিশ্বাস যখন ভাঙছিল, তখনই য়ুরোপে সত্য হয়ে উঠেছিল আর এক বিশ্বাস। তার নাম সমাজতন্ত্র। মানবতায় বিশ্বাসী কবি তাকে অবিশ্বাস করেন নি। আত্মগত নৈরাশ্যে নিষ্পিষ্ট হতে হতে তিনি কোনো তুরীয় আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, নির্জিত হন নি সেই নৈরাশ্যের দ্বারা; বরং মৌলিক বিরোধ সত্ত্বেও বিশ্বাস করেছেন জায়মান সমাজতন্ত্রকে, আর তার উপর ন্যস্ত করেছেন সকল আশা। অর্থাৎ তাঁর এক বিশ্বাসের ভাঙন ও আর এক বিশ্বাসের উদ্ভেদের মধ্যে সম্পর্কটা নিবিড়। সে-সম্পর্ক কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ। সে-সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক।

প্রাণগত মূল্যবোধ যদিও তাঁকে পিছন থেকে টেনেছে শেষ পর্যন্ত, তবু ধনতন্ত্রের বিবেকহীন লুব্ধতা ও দস্যুবৃত্তি তাঁকে নিয়ে গিয়েছে সমাজতন্ত্রে। শুধু শ্রেণীগত অবস্থানেই নয়, তাঁর স্বভাবে এবং উদারনৈতিক চিন্তা-ধারাতেও বাধা কম ছিল না। তৎসত্ত্বেও, সমাজচিন্তক ও সমাজকর্মী যিনি,

যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-কর্ম সমস্তই মানবমুখীন, তাঁর প্রবর্তনা ছিল অলঙ্ঘ্য ও অব্যর্থ। একান্তভাবে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি সমাজতন্ত্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিশ্ববীক্ষার যে উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন দেশ, কাল, পরিবারের সূত্রে এবং যা ছিল তাঁর মর্মগত সত্য, তার থেকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষা দূরস্থান। অনেক বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অবশেষে জীবন তাঁকে সেই দূরস্থানের দিকেই চালনা করেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বচিন্তা কি অবসরতত্ত্ব কিংবা ঈশ্বরানুভব একদিকে, আর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থিত সমাজতন্ত্র, বিশেষত শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারার একনায়কত্ব। দুই বিপরীতের মধ্যে সেতুর মতো কাজ করেছে মানুষ—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যার সর্বনাশে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। ভোলা উচিত নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রণাম কেবল ঔপনিষদ ব্রহ্মের উদ্দেশে নয়—মানবব্রহ্মের চরণেও। রুশদেশে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ও অভাবিত সৃজনশীলতা দেখে তাঁর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা, সমর্থন ও সতর্কবাণী—সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবে সম্ভাবনাময় ও উত্তরণমুখী। "মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি"[৪]—এ কি কম কথা? যখন নৈরাশ্যের এক অদ্ভুত আঁধার ঘন হয়ে উঠছিল বিশ্বময়, তখন তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখেছিলেন এবং বিপন্ন বিশ্বাসকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই উপলব্ধির ও ঘোষণার আন্তরিকতায় আমাদের সন্দেহ নেই।

২.

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"...রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ,

Scanned with CamScanner

কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।”[৫]

এই আত্মদর্শী উন্মোচন আমাদের পক্ষে এক অপরিহার্য পথনির্দেশ। এই আলোতে বোঝা যায়, সমাজতন্ত্র বিষয়ে তাঁর মনোভাবের অন্বেষণে শুধুমাত্র ‘রাশিয়ার চিঠি’ কিংবা তৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মন্তব্য যথেষ্ট, যুক্তিসংগত ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন নয়। কবি যেমন বলেছেন ঠিক সেইভাবে, ঐতিহাসিক পরম্পরায় ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে, পরিবর্তনশীলতা ও ঐক্যসূত্রকে মাথায় রেখে, আমরা অনুসন্ধানে আগ্রহী। এই অনুসন্ধানে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় মন্তব্যের ধারাবাহিক সংকলনই যথেষ্ট নয়; সেই সঙ্গে প্রয়োজন স্থির বিষয়ের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখে আনুষঙ্গিক চিন্তা, সৃষ্টি এবং কর্মের অনুধাবন।

৩.

আরো একটি কথা। এ-কাজে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর স্বভাব ও জীবনদর্শনকে বিস্মৃত হলে চলবে না। তাঁর ‘মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে’ দেখার চেষ্টায় তাঁর কি প্রচলিত মতের—কারো প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। মতান্ধ সমালোচনার দ্বারা তাঁর জটিল ও বহুমুখী সত্তার নিগৃহীত হবার আশঙ্কা অমূলক নয়। তাঁর সমগ্রতাকে ভুলে গিয়ে সমালোচকেরা কখনো তাঁর আধ্যাত্মিকতায় আমাদের মোহিত করতে চেয়েছেন, কখনো সেই আধ্যাত্মিকতার অন্তরালে শ্রেণীস্বার্থের সন্ধান পেয়েছেন কেউ কেউ এবং তাঁর মহিমাকে নিন্দালাঞ্ছিত করেছেন। কালের প্রভাবে এইরকম হয়ে থাকে এবং এমন নিগ্রহ বোধ হয় মহতের নিয়তি। আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথের মর্মগত—এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য—বৈজ্ঞানিক মানসিকতার আবাহনে তাঁর অনলস ও আজীবন অধ্যবসায়। রবীন্দ্রনাথ এমন এক মানুষ যাঁর মধ্যে দেহ ও আত্মার, বাস্তব অস্তিত্বের ও

Scanned with CamScanner

আধ্যাত্মিক অভীপ্সার সামঞ্জস্যের সাধনা সত্য হয়ে উঠেছিল। তাঁকে কাউন্ট কাইসারলিঙের মনে হয়েছিল 'অনন্ত একের জীবন্ত বিগ্রহ'। এই প্রশস্তি কোনো পৌত্তলিক হিন্দুর অতিভক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন-চর্যায় সেই এক ছিল নিত্য আশ্রয়; বীভৎস বাস্তবের মধ্যে নিশ্বাস নিতে নিতেও অনন্ত একের সঙ্গে নিরন্তর যোগযুক্ত ছিলেন তিনি। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো / সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' —'গীতাঞ্জলি'র কবির এই চেতনা পরবর্তীকালে মিথ্যা হয়ে যায় নি।

ব্যক্তিচেতনার বিকাশে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্বন্ধ যেমন চালিকা শক্তি, তেমনি তুচ্ছ নয় পরিবার-পরিজন ও ব্যক্তিস্বভাবের প্রভাব। মানুষ শুধু বিশেষ ব্যবস্থা ও অবস্থার সৃষ্টি নয়, তার স্রষ্টাও। স্রষ্টা যেমন মানবসমষ্টি, তেমনি ব্যক্তিও। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র ও পৌত্র প্রিন্স হন নি, কিংবা হবার চেষ্টায় জীবনটাকে উৎসর্গ করেন নি। একজন হয়েছেন রাজর্ষি, অন্যজন মানবমুক্তির তপস্বী। এই তথ্যের তাৎপর্য বিস্মৃত হলে উৎসাহিত হয় যান্ত্রিক বিচার, যার ফলে অপাবৃত হয় রবীন্দ্রনাথের গহন সত্তা—ইংরেজের ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে যাঁর নাকি গান্ধর্বমতে পরিণয় ঘটেছিল! তর্ক বৃথা। জাতীয় বুর্জোয়া ও মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে ঔপনি-বেশিক শাসনের স্বার্থের মিলন যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি সত্য উনিশ শতকের উত্তরার্ধ থেকে তাদের ক্রমবর্ধমান স্বার্থসংঘাত। অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈরাজ্যের এবং মধ্যযুগীয় জাড্যের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে একদা রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখের শ্রেয় মনে হয়েছিল এবং বিদেশী শাসনেরও এক প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁরা দেখেছিলেন—কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কি শ্রেণীগত স্বার্থই তাঁদের ইংরেজপ্রীতির কারণ ছিল না। তাঁদের ঐ বিশ্বাস ও মোহ এক পুরুষ পেরোতে না পেরোতে তাঁদেরই বংশধরদের কাছে যে মিথ্যা হয়ে যেতে লাগল তার একটি বড় প্রমাণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যাঁদের আমরা বলি প্রতিভা, তাঁরা আকাশ থেকে পড়েন না, হঠাৎ মাটি ফুঁড়েও ওঠেন না; বিশেষ দেশ-কালের কোলেই তাঁদের জন্ম ও বৃদ্ধি। ইতিহাস থেকে সমুত্থিত হয়েই ইতিহাসকে

ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেন তাঁরা। ইতিহাসের নিয়মেই সমকালের নানা বিরোধ তাঁদের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই সব বিরোধের সমাধানে তাঁদের চিন্তা ও চেষ্টা তাঁদেরকে লোকোত্তর ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনি এক মানুষ, এক প্রবুদ্ধ সত্তা।

৪.

সার্বভৌম প্রতিভার অধিকারী হলেও এবং আজীবন রাজনৈতিক চিন্তায় ও তার প্রচারে ব্যাপৃত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক ছিলেন না। রাজনৈতিক রচনায় যে-ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে প্রচলিত পরিভাষার অভাব এবং নিজস্ব অনেক উদ্ভাবনা আছে। ফলে তাঁর বক্তব্য অনেক সময় সেই সুস্পষ্টতা ও নিশ্চিতি পায় নি—যা এ-জাতীয় রচনায় বাঞ্ছিত। তৎসত্ত্বেও তাঁর সংবেদনশীলতা ও কল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈপ্সিত অর্থের সঞ্চারে সক্ষম। তাই, শুধু তাঁর কথা নয়—সে-কথার ব্যঞ্জনাও অনুধাবনযোগ্য। নইলে কথা থেকে অর্থ পেলেও কথকের অভিপ্রায়টি ধরা যাবে না সব সময়, তার অর্থেও কিছু অভাব থেকে যাবে। "ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়।" তাঁর ভাষায় ঐ ইঙ্গিত যে অনেকখানি, এ তো সকলেই জানেন। রাজনীতিবিদদের রচনায় যেমন প্রণালীবদ্ধ চিন্তা থাকে, থাকে যুক্তির শৃঙ্খলা ও শাসন, তথ্যের সমারোহ, তত্ত্বগত অনুশাসন ও প্রায়োগিক কৌশলের দ্বৈত, তাঁর কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁর রচনা অভিজ্ঞতার মঞ্চে স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞার যুগলবন্দী; যুক্তিকে একান্ত ক'রে না তুলে চিন্তাকে তিনি মুক্তি দেন স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির স্রোতোধারায়, উপমায় উপমায় জাগিয়ে তোলেন আত্মগত উপলব্ধির অব্যবহিত বোধ। অর্থাৎ—অন্যত্র যেমন, রাজনৈতিক রচনাতেও তাঁর কবিস্বভাব ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবত কবি—যদিও কবিমাত্র নন। কবি ও মনীষী বললে হয়তো অনেকটা বলা হয়। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সমকালীন বিশ্বজীবনে তাঁর লিপ্ততা কারো অজানা নয়। ঐ জৈবনিক সম্পর্ক থেকেই মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে জেগে উঠত এক প্রৈতি যা তাঁকে

বারে বারে উৎক্ষিপ্ত করত শিল্পীর ধ্যানের আসন থেকে তর্কমুখর ও দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ রাজনীতির ভুবনডাঙায়। কিন্তু অচিরেই সেই আবহাওয়ায় ক্লিষ্ট বোধ করতেন তিনি এবং তখন নিজেকে প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে নিমগ্ন হয়ে যেতেন শিল্পের সাধনায়।[৬] এই দোলাচলচিত্ততা একদিক থেকে দুর্বলতা, অন্যদিক থেকে মহত্ত্ব যা তাঁর স্বভাবের অলঙ্ঘনীয় অন্তর্মুখিতা সত্ত্বেও বৃহৎ জীবনে লিপ্ততার ফল। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী তাণ্ডব দেখে একবার তিনি বলেছিলেন,

"এইসব দেখেশুনে, এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব আমি বেহালা বাজাবো, আর ওদিকে মানুষের আহুতি নিয়ে এক বীভৎস আগুন পুষ্ট হবে।"[৭]

এই আততি ও আকুলতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; নিছক তত্ত্বগত বিচার যে এক্ষেত্রে অচল, এবং তাঁর প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা যে ঐ নৈতিক মূল্যে মহান, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

সাধারণের তুলনায় কবিরা বেশি সংবেদনশীল। কবিদের মধ্যেও আবার তরতম আছে। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীলতা ছিল আত্যন্তিক। সমকালীন নানা সমস্যা ও সংকট তাঁর চিত্তে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত; তাতে তাঁর চিত্তই শুধু ব্যাকুল হত না, শরীরও কম-বেশি বিকল হত। তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই অনুরূপ নানা ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে, জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যার পর, ফ্যাসিস্ত ইতালি ভ্রমণের শেষে, মিস র‍্যাথবোনের মন্তব্যে—এবং আরো অনেক উপলক্ষে কবির প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আমরা জানি। তাই, তাঁর রাজনৈতিক মতামতের বিচার ঐ সংবেদনশীলতা বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাঁর চিন্তাকে তাঁর বেদনা থেকে বিযুক্ত করে দেখলে তাই পাওয়া যাবে—যা মেলে অস্থিবিদ্যার ক্লাসে। আমরা অস্থিতত্ত্বে উৎসুক নই; আমাদের আগ্রহ সজীব অস্তিত্বের প্রাণক্রিয়ায়। এখানে আমরা কোনো রাজনীতিবিদের চিন্তার বিচারে প্রবৃত্ত নই, সমাজতন্ত্রের তত্ত্বালোচনাও আমাদের অভিপ্রেত নয়; আমরা অনুসরণ করতে চাই এক সৃজনশীল সত্তার স্রোতোময় চেতনা—যা সমাজতন্ত্রের সঞ্চারে কখনো

Scanned with CamScanner

ক্ষুব্ধ, কখনো উদ্দীপ্ত।

৫.

আরো একটি কথা। এই অনুসরণ হবে একান্তভাবে তথ্যাশ্রয়ী। অতএব পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি (ক্বচিৎ তার পুনরাবৃত্তিও) এখানে শুধু উপাদান নয়, প্রমাণও। তথ্যের মধ্যে প্রধান হল রবীন্দ্রনাথের রচনা, বিবৃতি, মন্তব্য, ভাষণ ও পত্র। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের স্মৃতিকথাও এক রকমের তথ্য। দু-একটি ব্যতীত এর কোনোটিই নূতন নয়, সমস্তই প্রকাশিত। সেই সব তথ্য একটি সূত্রে গ্রথিত করলে, দেশ-কাল-পাত্রের পটভূমিতে স্থাপন করলে, যথার্থ তাৎপর্যের সন্ধান মেলে—পুরাতনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে নূতন অর্থের আলো। প্রকীর্ণ তথ্য প্রকীর্ণ বলেই সম্পূর্ণ ও স্বয়ম্প্রকাশ নয়। আবার সকল তথ্যের মূল্যও সমান নয়। সংকলনের সময় সকল তথ্যই গৃহীত হবে, তবে সেই সঙ্গে নিরূপিত হবে তাদের মূল্য। তার পর সব মিলিয়ে, অন্তর্নিহিত চেতনা-প্রবাহকে অনুসরণ করতে করতে, আমরা পৌঁছে যাবো এক অখণ্ডতায়, এক পরিণামপ্রাপ্ত উপলব্ধিতে।

Scanned with CamScanner

উল্লেখপঞ্জী

১. 'সভ্যতার সংকট'—রচনাবলী (১৩)। পৃঃ ৪০৬
২. তদেব। পৃঃ ৪০৭
৩. তদেব
৪. চিঠিপত্র (১১)। পৃঃ ১৪৬
৫. 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'—রচনাবলী (১৩)। পৃঃ ৩৭০
৬. এণ্ডরুজকে একটি পত্রে কবি লিখেছিলেন—
"রাজনৈতিক তর্ক মাঝে মাঝে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার মতো হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে শরীরে মনে একটা অস্থিরতার ভাব রেখে যায়। রাজনীতি আমার প্রকৃতির একেবারেই বিরোধী। তবু হতভাগ্য দেশে অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মেছি বলে আমাদের পক্ষে এসব উচ্ছ্বাস এড়ানো দুঃসাধ্য। এখন একা বসে ভাবি—যেখানে ফুল ও তারার অন্তহীন ছন্দে পৃথিবীর সব অন্যায় মনে মিলিয়ে গিয়ে সুষম হয়ে ওঠে, সেই অসীম শান্তির অন্তরে ডুবে গিয়ে আমার চিত্তটিকেও শান্ত স্থির করে নিই"—৬ই মে ১৯২১। রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী (১৯৬৭)। পৃ. ১১২
৭. এণ্ডরুজকে পত্র, ১৯২৬। রম্যাঁ রলাঁর 'ভারতবর্ষ' (১৯৭৬)—অনুঃ অবন্তী সান্যাল। পৃ. ১৫৮

পটভূমি

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল ধনতন্ত্রের কাল। অশীতিবর্ষ জীবনের প্রথমার্ধে তিনি দেখেছেন ধনতন্ত্রের সৃজনশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদের উত্থান; আর তারই দুর্মোচ্য অন্তর্বিরোধ, বিশ্বময় তাণ্ডব এবং সেই বীভৎসতা বিদীর্ণ ক'রে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়, প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম—অর্ধান্তরে তাঁর প্রবল অভিজ্ঞতা। ফলে মনের দিক থেকে তিনি দুই শতকেরই প্রতিনিধি। তাঁর চিন্তা-ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ এই যুগ; এর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, উল্লাস ও উদ্বেগ, নৈরাশ্য ও নূতন আশা। পরাধীনতার মধ্যেও যিনি ইংরেজের ঔদার্যে আস্থাশীল, উদারনৈতিক ভাবাদর্শে যাঁর বিশ্বাস অবিচল, সমমর্যাদায় পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের স্বপ্নে যিনি মশগুল—তিনি উনিশ শতকের ভাবনা-কামনার পূর্ণ প্রতিনিধি। আর যিনি ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, যিনি আন্তর্জাতিকতার ও সহযোগিতার বাণী নিয়ে দেশে দেশে ঘুরেছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে উদ্বোধিত করেছেন সকলকে, যিনি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে আশীর্বাদ করেছেন ও সতর্ক ক'রে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়—তিনি এই শতাব্দীর। দুইয়ের মধ্যে কোনো যান্ত্রিক বিভাজন কিংবা নৈযুজ্য অভাবনীয়। পূর্বকাণ্ডে যা ছিল বীজের মতো বিকীর্ণ, প্রচ্ছন্ন, হয়তো-বা উদ্ভিন্নপ্রায়—উত্তরকাণ্ডে তা বিকশিত ও পরিণত। আর যাকে মনে হয় অ-পূর্ব, যা একান্তই বিংশ শতাব্দীর, তাও অসংলগ্ন নয়। একের ভিতর থেকে কিভাবে উদিত হলেন অন্যজন—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে-ইতিহাস বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক; এখানে যা অপরিহার্য, যে বিষয়টি উপেক্ষা করলে সমাজতন্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিমুখিতা হয়ে যায় এক আকস্মিক প্রৈতি মাত্র, অতএব বৃন্তহীন পুষ্পসম, তা হল ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী শাসক ইংরেজকে

দেখেছিল আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার ‘চিত্তপ্রতীক’ রূপে, ‘চিত্তদূত’ রূপে। বিদেশী শাসকের ঐ গরিমা চুম্বকের মতো সেদিন তাঁদের আকর্ষণ করেছিল এবং অভিভূত। ফলত পরাধীন হয়েও তাঁরা ইংরেজের গুণগ্রাহী ও ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, এমনকি ভাবের বৃন্দাবনে তার সাথে মধুযামিনীর স্বপ্নও দেখেছিলেন। ইতিহাসের ঐ প্রেক্ষিত থেকে সুদূর এই সাম্প্রতিকে তা যতই অবিশ্বাস্য অথবা ‘অবৈধ’ মনে হোক না কেন, এর ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নিছক মুষ্টিমেয় মানুষের পাটোয়ারি বুদ্ধিতেই নিহিত ছিল— অন্য কোথাও নয়, এরকম ভেবে নেওয়ার অর্থ যান্ত্রিক সরলীকরণ ও একদেশদর্শিতার ফাঁদে পড়া। সেই বিপত্তি থেকে রক্ষা করে কবির এই স্বীকারোক্তি—

“যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা ; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন।···য়ুরোপের সংস্রব এক দিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা ; আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।”[১]

এই বৈজ্ঞানিক জগৎতত্ত্ব ও উদারনৈতিক মানবতাবাদ ছিল ভাবের জগতে তাঁদের এক পরম প্রাপ্তি এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এর দ্বারা অধিকৃত হয়েছিলেন। অন্যদিকে বাস্তবে ঘটছিল বিপরীত সম্ভোগ ; সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তাঁরা তাই পাচ্ছিলেন যা পাওয়া উচিত ছিল সাম্রাজ্যবাদের নিয়মে। এই বৈপরীত্যে য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন এক দোটানায়, যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চেতনায় কমবেশি বিদ্যমান ছিল জীবনের উপান্ত পর্যন্ত। তবু এই ভাবুক কবি যে তাঁর তরুণ বয়সেই,

Scanned with CamScanner

সেই মুগ্ধতার দিনেও, ভেদ করতে পেরেছিলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলগত অনৈতিকতা ও অন্তর্বিরোধ এবং তখন থেকেই যে তিনি এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, শুরু করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লৈখিক আক্রমণ, তার প্রমাণ রয়ে গেছে 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৭৮), 'চীনে মরণের ব্যবসায়' (১৮৮১), 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী (১৮৯১), 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৮৯৩), 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৮৯৪) প্রভৃতি নানা রচনায়। 'মন্ত্রি অভিষেক' (১৮৯০) প্রবন্ধের বিচ্যুতি যেহেতু এক ব্যতিক্রম, সেহেতু প্রাগুক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনাকেই তাঁর সেই সময়কার যথার্থ মনোভাব রূপে গণ্য করা অসংগত নয়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে একটি দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে জেগে ওঠে তাঁর মনে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ধনতান্ত্রিক য়ুরোপের বৈভীষিক রাজনীতির প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সেটা। পরাধীন ও অধঃপতিত জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি ফিরে দাঁড়ান প্রাচীন ভারতের দিকে, সেখান থেকে আহরণ করতে চান সঞ্জীবনী ; এক কল্প-ইতিহাসের গৌরববোধে ও মোহে ছেয়ে যায় তাঁর মন। এমন কথাও বলেন—"শুনো না কী বলে তারা"। অতীতাশ্রয়ের সেই আবেশের মধ্যেও যা তাঁর চৈতন্যের ভিন্ন এক মাত্রাকে ইংগিত করে তা হল বিশ্বমনস্কতা। তাঁর অন্তর্লোক তখন আলোড়িত হচ্ছিল যে যুগসংকটের উপলব্ধিতে, বর্তমান আলোচনায় তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কবি যখন অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, যখন অসীম শূন্যে তাঁর প্রাণ-মন উধাও হতে চাইছিল, অন্তরতম অনুভবে যখন জেনেছিলেন "কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু/কোথাও বিচ্ছেদ নাই", তখনই দেখি সেই তন্ময়তা ভেদ ক'রে উঠে এসেছে ভিন্ন এক স্বর, এক উদ্বেগাকুল ঘোষণা।—

> "শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ-মাঝে
> অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি
> বাজে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী
> ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।”[২]

যে সভ্যতার ছবি কবির কল্পনায় হয়ে গেল বিষাক্ত নাগিনীর, সে কোন্ সভ্যতা ? ‘নৈবেদ্য’র একাধিক চতুর্দশপদীতে তার কথাই বলেছেন তিনি ; শুধু বলা নয়, সেই সংলাপ এক অভিনব ও আশ্চর্য উন্মোচন। যেমন—

“স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম…………
লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।”[৩]

কিংবা—

“ …চিতার আগুন
পশ্চিমসমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।”[৪]

এইরকম পৌনঃপুনিক উচ্চারণে দুটি প্রত্যয় প্রকাশ পেল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মূলে রয়েছে বিবেকহীন ও সীমাহীন লোভ, আমাদের শাস্ত্রমতে যা রিপু। আর রিপুটি যে রাজনৈতিক তত্ত্বের আশ্রয়ে অবাধ তার নাম জাতিপ্রেম—পরে যাকে তিনি ইংরেজিতে বলেছেন ‘Nationalism’। এই প্রত্যয় উত্তরোত্তর তাঁর চিত্তে প্রবল ও দৃঢ় হয়েছে এবং পরবর্তীকালে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা রচনায় তিনি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই কেন তিনি অধিকতর মুখর হয়ে উঠলেন ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে ? এ-প্রশ্নের উত্তরে কবিতায় বলেছেন—

“শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।

Scanned with CamScanner

দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।"[৫]

য়ুরোপীয় সভ্যতার সংকট শুধু য়ুরোপেরই সংকট নয়, বিশ্বসংকট—এই ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধিতে তিনি পৌঁছেছিলেন। সমকালে রচিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (১৯০১) প্রবন্ধে সংকটটিকে ব্যাখ্যা ক'রে লিখেছেন—

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি পড়িবে, তাহার পূর্ব সূচনা দেখা যাইতেছে।"[৬]

যে স্বার্থের কথা বলেছিলেন কবিতায়, প্রবন্ধে তাকে চিহ্নিত করেছেন 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থ' নামে। এই স্বার্থের প্ররোচনায় মানবধর্ম লজ্জিত হচ্ছে য়ুরোপেও। তাই, 'গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র' আজ যখন য়ুরোপের মুখে শোনেন তখন তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না তাঁর, মনে হয় 'পরিহাসবাক্য'।

এই বছরেই প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধ 'বিরোধমূলক আদর্শ'। তাতে লেখেন—

"মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়-টিজ্‌মের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশনতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনও য়ুরোপে দেখিতে পাই না।

পরস্পরকে যথার্থরূপে জানাশুনা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে। নেশনের মেরুদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনো প্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরাজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য

Scanned with CamScanner

নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশংকাজনক। এ স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।"[৭]

ন্যাশনালিজম ও পেট্রিয়টিজম, অর্থাৎ জাতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা—এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য কবি করেন নি। সদৃশ না হলেও দুইয়ের এই একীকরণ ঘটেছে সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। শতাব্দীর সূচনায় যা ছিল আশংকা, তা সত্য হয়ে ওঠে দ্বিতীয় দশকে। যুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। যে হত্যাকে উপলক্ষ করে যুদ্ধ শুরু হল, সেটা উপলক্ষমাত্র—উৎস ছিল অনেক গভীরে এবং তার আয়োজন চলছিল অনেক দিন ধ'রে। কবি তাঁর আশংকার কথা জানাচ্ছিলেন বিশ শতকের গোড়া থেকে। যুদ্ধ বাধার পর ডিসেম্বর মাসে তার উৎস ও উপসর্গ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লিখলেন এক অসাধারণ প্রবন্ধ—'লড়াইয়ের মূল'। তাতে বললেন—

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময় জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজ্যও সেইখানেই; জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্য-প্রবাহের মতো রাজত্ব-প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব আর-কখনো ছিল না।

যুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।...

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই রীতিতে প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।"[৮]

শেষ বাক্যটির বক্তব্যের ভার শুধু নয়, গূঢ়তা ও তীক্ষ্ণতা, ঐতিহাসিক যথার্থতা—গভীরভাবে ভাবায়। ধনতন্ত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে উপস্থিত যুদ্ধের ঐকান্তিক সম্বন্ধের উপর কবি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ আজ পণ্য। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য অবিচ্ছেদ্য। স্বদেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের সমারোহ আসলে ধনতান্ত্রিক অভিসন্ধিকে গোপন করবার জন্য মুখোশ। যুদ্ধের মূল রয়েছে ঐ মুখোশের আড়ালে, ধনতান্ত্রিক স্বার্থের তত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথের এই সমাজবীক্ষণের মহিমা প্রখর হয়ে ওঠে যখন একে দেখি বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটে। মনে পড়ে, এসব কথা সেই সময় বলছিলেন লেনিন ও তাঁর সতীর্থ অল্প কয়েকজন, বলছিলেন তখনই যখন ঐ মুখোশটাকে মুখশ্রী ভেবে য়ুরোপের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শপথ জলাঞ্জলি দিয়ে আরোহণ করেছিলেন উল্টোরথে। আর বলেছিলেন য়ুরোপের কয়েকজন মুক্তমনা শান্তিবাদী। তাঁদের মতোই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধকে দেখলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে, এবং সেই সূত্রে খুঁজে পেলেন তাঁর মূল। সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে তুলনায় একে বিস্ময়কর মনে হলেও এ কোনো আকস্মিক উদ্ভাস নয়; কবি হঠাৎই চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠেন নি। পিছন ফিরে দেখলে অবশ্যই চোখে পড়বে যে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল গুণগ্রাহী

অথচ মোহমুক্ত, অনুসন্ধানী কন্তু বিচারশীল। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতার পটে কবি তাই নিজস্ব ন্যায়ে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করছিলেন যৌবনোন্মেষের সময় থেকে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মূল খুঁজতে গিয়ে তাঁর যে ভুল হয় নি, সে বোধ হয় এইজন্য।

আধুনিক বিশ্বসংকট যে ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি, এ-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। বিষয়টিকে যখন ঘুরে-ফিরে তাঁর নানা রচনায় উত্থাপিত হতে দেখি, তখন বুঝতে পারি এই ভাবনায় কেমন ছেয়ে ছিল তাঁর মন। এর দ্বারা এমনই অধিকৃত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে ভিন্ন প্রসঙ্গেও একে ভুলে থাকতে পারেন নি। 'লড়াইয়ের মূল' লেখবার মাত্র মাস তিনেক আগে 'লোকহিত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদ্‌জনক হইয়া উঠে তখন বিপদ্‌টাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই, ওদেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে অল্প-স্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।"[৯]

মুনাফা ও দারিদ্র্যের অর্থশাস্ত্রীয় আলোচনা কবির কাছে প্রত্যাশিত নয়। এখানে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও নিজস্ব সমাজবীক্ষণ অভ্রান্তভাবে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সত্যে। শ্রেণী-পরিচয় যে সেই দৃষ্টিকে আবিল ক'রে তোলে নি সেটা লক্ষণীয়। কিছুই রেখে-ঢেকে তিনি বলেন নি ; এমনকি তাঁর পক্ষে যা অরোধ্য সেই অলংকারও প্রশ্রয় পায় নি। 'ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে' এবং সেই দারিদ্র্য ও অসাম্য দূর করবার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই তার হতে পারে না। কবির কথায় ধনী ও শোষক বস্তুত

সমার্থক, এবং এ-বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ যে, 'ধনের ধর্মই অসাম্য'। স্বভাবত যিনি কবি, এবং আত্মধর্ম বিষয়ে যিনি সর্বদা সচেতন, সেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে উৎক্ষিপ্ত হলেন কবিতার আত্মময় অমরাবতী থেকে। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ হল তূর্য, কলম হল কৃপাণ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পথে কবি তিন মাস জাপানে কাটিয়ে যান। আধুনিক জাপান তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। শতাব্দীর সূচনাবধি যে-চিন্তায় বিদ্ধ ছিল তাঁর চিত্ত, যে চিন্তা থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিষয়ে তিনি এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সমকালীন বিশ্বরাজনীতির ব্যাখ্যায় তাঁর যে অন্তর্দৃষ্টির আলোকপাত ঘটছিল—সে-সমস্তই সুসংঘবদ্ধ হল জাপানে ও আমেরিকায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীতে। জাপানের যে মুখচ্ছবি কবিকে বিচলিত করেছিল এবং যার সমালোচনায় তৎক্ষণাৎ তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন তার পরিচয় দিয়ে জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন—

"আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জাপান মিত্রপক্ষ (ইংরেজ-ফরাসী-ইতালী-রুশ) অবলম্বন করিয়া চীন হইতে জারমানদের তাড়াইয়া সিঙটাঙ অধিকার করিয়াছে। চীন মাত্র চারি বৎসর পূর্বে (১৯১২) রিপাবলিক স্থাপন করিয়াছে; অব্যবস্থা চারি দিকে। জাপান-জারমান যুদ্ধের পর চীন জাপানকে জারমানদের অধিকৃত রাজ্যের বাহিরে জাপানী সৈন্য সরাইয়া লইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করে। জাপান য়ুরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতির অজুহাতে চীনের এই ন্যায্য দাবিতে কর্ণপাত করিল না, বরং ১৯১৫ সালের গোড়ায় চীনে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট য়ুন-শি-কাইয়ের নিকট ২১ দফা দাবি পেশ করিল। এই দাবিগুলি মানিয়া লইলে চীনের স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত হয়; অথচ জাপান বেয়নটের মুখে সকল দাবিই চীন-সরকারের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিল।...

রবীন্দ্রনাথ জাপানে পৌছিবার কয়েকদিনের মধ্যে য়ুন-শি-কাই-এর মৃত্যু হয়; কবি গিয়াই দেখিলেন যে জাপানের সর্বত্র চীনকে লাঞ্ছিত করিবার

বিপুল আয়োজন চলিতেছে।··
স্পর্শকাতর কবিচিত্ত জাপানের রণকণ্ডূয়নের ও সাম্রাজ্যস্ফীতির লক্ষণসমূহ দেখিয়াই স্বভাবতই উত্তেজিত হইয়াছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় কবি লিখিলেন 'The Spirit of Japan' ও 'The Nation."[১০]

এই প্রতিক্রিয়ায় যে-সব ভাষণ কবি জাপানে ও আমেরিকায় দিলেন তা পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত হয়ে 'Nationalism' নামে গ্রন্থাকারে বের হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। এতে প্রবন্ধ আছে তিনটি—'Nationalism in the West', 'Nationalism in Japan' ও 'Nationalism in India'। এই সব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ নামে যাকে অভিহিত করেছেন তা একান্তই তাঁর নিজস্ব ধারণা। বস্তুত অন্ধ স্বজাতিপ্রীতিকে তিনি ঐ নামে চিহ্নিত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থের সঙ্গে সে-ধারণার অসংগতি একদা এণ্ডরুজ কবিকে জানিয়েছিলেন এবং 'Nation' ও 'State' যে কবির কথায় এক হয়ে গেছে—তাও বলেছিলেন। কবি তবু তাঁর মত বদলান নি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ১৯২৪ সালের এই উক্তি—

"I have come to warn you in Japan—the country where I wrote my first lectures against Nationalism at a time when people laughed my ideas to scorn. They thought I did not know the meaning of the word, and accused me of having confused the word Nation with State. But I struck to my conviction, and now after the war, do you not hear everywhere the denunciation of this spirit of the Nation, this collective egoism of the people. which is universally hardening their hearts ?"[১১]

ভাষা যাই হোক না কেন, কবির সমালোচনার বিষয় ছিল য়ুরোপীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদ একই সঙ্গে যার আশ্রয় ও আশ্রিত। যেহেতু ঐ ভাবাদর্শ 'the most powerful anæsthetics' এবং যেহেতু তা মুষ্টিমেয় বিবেকবান ব্যতীত সকলকেই বিবেকহীন ক'রে তুলেছিল, সেহেতু তার বিরুদ্ধে শাণিত হয়েছে তাঁর আক্রমণ। 'নেশন'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ

Scanned with CamScanner

ক'রে কবি 'Nationalism in the West' প্রবন্ধে বলেছেন—

"A nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose."[১২]

ঐ প্রবন্ধেই অন্যত্র মন্তব্য করেছেন—

"—the Nation which is the organised self-interest of a whole people, where it is least human and least spiritual."[১৩]

'Nationalism in Japan' প্রবন্ধে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—

"It is the aspect of a whole people as an organised power."[১৪]

অতএব কবির মতে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে একটি জনগোষ্ঠীর সংগঠিত শক্তি হল নেশন। এই শক্তি এক অবচ্ছিন্ন ভাবমাত্র; না আধ্যাত্মিক, না মানবিক। একান্তভাবে সামষ্টিক স্বার্থ চরিতার্থতার এক যান্ত্রিক উদ্দেশ্য থেকে এর উদ্ভব।

এই শক্তির পূজায় মেতে উঠেছে য়ুরোপ। য়ুরোপের ধনী রাষ্ট্রসমূহের রাজনীতি ও সমসাময়িক অবস্থা বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে—

১. "The truth is that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the centre of Western nationalism ; its basis is not social co-operation. It has evolved a perfect organisation of power, but not spiritual idealism. It is like the pack of predatory creatures that must have its victims. With all its heart it cannot bear to see its hunting grounds converted into cultivated fields. In fact, these nations are fighting among themselves for the extension of their victims and their reserve forests."[১৫]

২. "And what is the meaning of these strikes in the economic world, which like the prickly shrubs in a barren soil shoot up with-renewed vigour each time they are cut down ? What, but that the wealth-producing mechanism is incessantly growing into vast stature, out of proportion to all other needs of society, and the full reality of man is more and more crushed under its weight ? This state of things inevitably gives rise to eternal

feuds among the elements freed from the wholeness and wholesomeness of human ideals, and interminable economic war is waged between capital and labour. For, greed of wealth and power can never have a limit, and compromise of self-interest can never attain the final spirit of reconciliation. They must go on breeding jealousy and suspicion to the end—the end which only comes through some sudden catastrophe or a spiritual re-birth."[১৬]

৩. "It is the continual and stupendous dead pressure of this inhuman upon the living human under which the modern world is groaning. Not merely the subject races, but you who live under the delusion that you are free, are every day sacrificing your freedom and humanity to this fetish of nationalism, living in the dense poisonous atmosphere of world-wide suspicion and greed and panic."[১৭]

৪. "The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation, that all its precautions are against it, and any new *Birth of* its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril. Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insects that are bred in the paralysed flesh of victims kept just enough alive to make them toothsome and nutritious."[১৮]

৫. "This European War of Nations is the war of retribution... The Nation has thriven long upon mutilated humanity. Men, the fairest creations of God, came out of the National manufactory in huge numbers as war-making and money-making puppets, ludicrously vain of their pitiful perfection of mechanism. Human society grew more and more into a marionette show of politicians, soldiers, manufacturers and bureaucrats, pulled by wire arrangements of wonderful efficiency."[১৯]

৬. "......there are grave questions that the Western civilisation has presented before the world but not completely answered. The conflict between the individual and the state, labour and capital, the man and the woman ; the conflict between the greed of material gain and the spiritual life of man, the organised selfishness of nations and the higher ideals of humanity ; the confiict between all the ugly complexities inseparable from giant organisations of commerce and state and the natural instincts of man crying for simplicity and beauty and fulness of leisure—all these have to be brought to a harmony in a manner not yet dreamt of.

We have seen this great stream of civilisation choking itself from debris carried by its innumerable channels. We have seen that with all its vaunted love of humanity it has proved itself the greatest menace to Man, for worse than the sudden outbursts of nomadic barbarism from which men suffered in the early ages of history."[২০]

৭. "The political civilisation which has sprung up from the soil of Europe and is over-running the whole world, like some prolific weed, is based upon exclusiveness. It is always watchful to keep the aliens at bay or to exterminate them. It is carnivorous and cannibalistic in its tendencies, it feeds upon the resources of other peoples and tries to swallow their whole future."[২১]

৮. "After centuries of civilisation nations fearing each other like the prowling wild beasts of the night-time ; shuttering their doors of hospitality ; combining only for purpose of aggression or defence; hiding in their holes their trade secrets, state secrets, secrets of their armaments ; making peaceofferings to each other's barking dogs with the meat which does not belong to them ; holding down fallen races which struggle to stand upon their feet ; with their right hands dispensing religion to weaker peoples, while robbing them with their left—is there anything in

Scanned with CamScanner

this to make us envious ? Are we to bend our knees to the spirit of this nationalism, which is sowing broad cast over all the world seeds of fear, greed, suspicion, unashamed lies of its diplomacy, and unctuous lies of its profession of peace and goodwill and universal brotherhood of Man ?"[২২]

৯. "Those who have made the gain of money their highest end are unconsciously selling their life and soul to rich persons or to the combinations that represent money. Those who are enamoured of their political power and gloat over their extension of dominion over foreign races gradually surrender their own freedom and humanity to the organisations necessary for holding other peoples in slavery. In the so-called free countries the majority of the people are not free ; they are driven by the minority to a goal which is not even known to them."[২৩]

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, জাতীয়তাবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্বালোচনা করছেন না ; জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও রূপ-ভেদ তাঁর আলোচ্য নয়। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি কী বোঝেন সেটা অবশ্য বুঝিয়েছেন ক্লান্তিহীন পৌনঃপুনিকতায়। বস্তুত তাঁর আলোচ্য আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা—হাতে যার জাতীয়তা-বাদের ধ্বজা, কিন্তু চরিত্রে যা জান্তব। উদ্ধৃতিগুলি থেকে তাঁর চিন্তাকে সূত্রাকারে সংকলন করলে পাই :

১. জাতীয়তাবাদের মূলে আছে বিরোধ ও বিজয়ের তত্ত্ব। সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতা এর নীতি। ফলে—মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রে অন্তহীন দ্বন্দ্ব।

২. জাতীয়তাবাদের মূলগত প্রবৃত্তি—লোভ ও স্বার্থপরতা। কাম্য—ধন, শক্তি ও আধিপত্য। উপায়—পীড়ন, লুণ্ঠন ও শোষণ।

৩. ধর্ম, নীতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ নয়, শুধু স্বজাতির স্বার্থ এবং সেই স্বার্থে অন্য জাতির সর্বনাশও এই মতে বিধেয়।

৪. এর স্বাভাবিক আচার হিংস্রতা ও রাক্ষসবৃত্তি, মিথ্যাচার ও পাপাচার।

৫. এতদ্বারা মানুষ আজ মনুষ্যত্ব থেকে ভ্রষ্ট, খণ্ডিত ও যন্ত্রে পরিণত।

৬. অতএব—"Nationalism is a great menace."

সন্দেহ নেই, জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার থেকে মূলে-স্থূলে পৃথক রবীন্দ্রনাথের ধারণা। ধনতন্ত্র, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, পশ্চিমী সভ্যতা—সমস্তই অঙ্গীকৃত হয়েছে তাঁর অভিহিত জাতীয়তাবাদে। আর এই কারণেই জাতীয়তাবাদের উপর তাঁর এবংবিধ আক্রমণ। তত্ত্বত জাতি ও রাষ্ট্র ভিন্ন হলেও তাঁর এই চিন্তাধারা ও আক্রমণের পশ্চাৎপটে আছে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হবে ঐ অভিজ্ঞতার উন্মোচক রূপে। একে জাতীয়তাবাদ বলায় আপত্তি অশাস্ত্রীয় নয়, কিন্তু সে-আপত্তিকে সর্বাতিশয়ী করে তোলায় ক্ষতি বোধ হয় আমাদেরই। তাতে যে আমরা মহান ভাবুকের মর্মবেদনা ও উৎকণ্ঠার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হব শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে হারাবো তাঁর চিন্তার নিহিতার্থকে, যার মধ্যে হয়তো পেয়ে যেতে পারি সেই পরশমণি—যাকে আমরা ঠিক চিনি না, কিন্তু হন্যে হয়ে খুঁজছি অনেক দিন। কবির কথায় এমন কিছু আছে যা উপেক্ষা করা যায় না, ভোলা যায় না, যা আজও আমাদের ভাবায়, সাম্প্রতিক পৃথিবীতে যার যাথার্থ্য হয়তো স্পষ্টতর হয়েছে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন, তেমনি আজও তাঁর চিন্তা ও সমালোচনাকে মনে হয় এক রাজনৈতিক মোহমুদ্গর। ধনতান্ত্রিক য়ুরোপের শক্তি ও সমুন্নতির অন্তস্তলে যে মানবতাবিরোধী অশুভ শক্তির অধিষ্ঠান এবং যার বিস্ফারিত দন্তপঙ্‌ক্তি পৃথিবী জুড়ে ঘনিয়ে তুলেছে নরমেধযজ্ঞ, তার রাজনৈতিক মোহ-আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কে না জানেন, ধনতন্ত্র কি সাম্রাজ্যবাদ আর জাতীয়তাবাদ এক জিনিস নয়। অন্ধ জাত্যভিমান ও পরজাতিবিদ্বেষকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক ক'রে দেখে কবি সুবিচার করেন নি—এ-ও অতি পুরাতন কথা। তবু যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে এ-যুগের সব থেকে বড়ো বিপদ বলছেন তখন শত যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও এই সন্দেহ ভিতর থেকে জেগে ওঠে: ভুলটা সত্যি-সত্যি কার, কবির না আমাদের? বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেমন তাঁর সমালোচনার উপলক্ষ ও লক্ষ্য, তেমনি তাঁর সমালোচনা জাতীয় স্বার্থান্ধতা

এবং জাতীয় অহমিকার বিরুদ্ধে। জাতীয়তাবাদের জন্মপত্রিকায় যাই থাকুক না কেন, অধুনা আমরা কি শুনছি, কি দেখছি? এই অপদেবতা যে-মাটিতে প্রথম পূজা পেয়েছিল সেখানেই কি সে অচল হয়ে আছে? দেশে-দেশান্তরে, অন্য সমাজ-ব্যবস্থাতেও ঘটে নি কি তার সংবৃত সংক্রমণ ও প্রতিষ্ঠা? তা যদি না হবে, তবে কেন আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেও সীমান্ত নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ? কেন সোভিয়েত ইউনিয়নে চীন দেখছে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আর সোভিয়েত ইউনিয়নের চোখে চীন ভয়ানক রকমের জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রসারণবাদী? কেন পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শোনা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ? কেন, কোন দুষ্ট শক্তির প্রভাবে, চীনের চোখে ভিয়েতনাম হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী? তত্ত্বত যাই হোক না কেন, বস্তুত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যে যান্ত্রিক, পীড়নকারী ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে উঠতে পারে তা আজ আর তর্কের বিষয় নয়। সমাজতন্ত্রের এতদিনের স্বপ্ন ও সাধনা আজ যখন এমনি সব প্রশ্নে জর্জরিত হতে থাকে তখন মনে পড়ে যায় কবির কথা—

"Therefore we must not forget that the scintific organisations vastly spreading in all directions are strengthening our power, but not our humanity. With the growth of power the cult of self-worship of the Nation grows in ascendancy ; and the individual willingly allows the Nation to take donkey-rides upon his back ; and there happens the anomaly which must have such disastrous effects, that the individual worships with all sacrifices a god which is morally much inferior to himself. This could never have been possible if the god had been as real as the individual."[২৪]

রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে দেখেছিলেন এক নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মানবীয় ব্যাপারে নৈতিক বিধানে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। মানুষকে নিছক এক জৈব সত্তা ব'লে তিনি ভাবেন নি, তাঁর চোখে মানুষ এক নৈতিক সত্তাও এবং তারই জন্য সে মানুষ। মনে পড়ে তাঁর এই দৃপ্ত ঘোষণা—

"...I assert that man's world is a moral world, not because we

Scanned with CamScanner

blindly agree to believe it, but because it is so in truth which would be dangerous for us to ignore. And this moral nature of man cannot be divided into convenient compartments for its preservation."[২৫]

১৯২৪ সালে চীন প্রদত্ত 'Civilisation and Progress' ভাষণে বলেছেন, সভ্যতাকে হয়ে উঠতে হবে এক নৈতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত, হতে হবে তারই প্রকাশ, নইলে প্রগতি হবে অর্থহীন। ঐ শক্তি তাঁর মতে এক সজীব ধর্ম এবং তাঁর দ্বারা মানুষ নীত হবে সহযোগিতা ও সমানাধিকারের লক্ষ্যে। শুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে পৃথক এই দৃষ্টির দৌলতেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের নঙর্থক দিকটিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, এবং বৃহৎ দেশ ও কালের পটভূমিকায় বিচার ক'রে তাকে তিরস্কার করেছেন তীব্র ভাষায়। এজন্য যাঁরা কবির উপর খাপ্পা হয়েছেন তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, জওহরলাল নেহেরুর মতো রাজনীতিক এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতাও জাতীয়তাবাদকে বৈর মনোভাবরূপে গণ্য করেছেন।[২৬] জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা কবির চোখে ধরা পড়ে নি, এমন চিন্তা অশ্রদ্ধেয়। কে না জানেন, যাঁরা আমাদের দেশকে যথার্থভাবে দেখতে শিখিয়েছেন, ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথ। একদা যে-কথা বলেছিলেন গানে সেই তাঁর মনের কথা : "ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা/তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।" তাঁর আন্তর্জাতিকতায় রাজনৈতিক বিষয়বুদ্ধির অভাব থাকতে পারে, আধ্যাত্মিক ব'লে তাকে অবাস্তব ও এক 'ইউটোপিয়া' মনে হওয়াও সম্ভব, কিন্তু তা মোটেও অর্থহীন নয়, নিরবয়বও নয়। তিনি চেয়েছেন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সংযোগ ও সাযুজ্য।

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন : যুদ্ধের আগুনে উগ্র জাতীয়তাবাদের দাহ হবে, জন্ম নেবে এক নতুন যুগ—যে-যুগে অর্থনৈতিক শোষণ থাকবে না, পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রী হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি, মানুষের ব্যক্তিত্ব মুক্তি পাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে। রুশ বিপ্লবে সেই

Scanned with CamScanner

নূতন যুগের স্বর্ণদ্বার উন্মোচিত হলেও কবির আশা পূর্ণ হয় নি। সমাজ-তন্ত্রের অভ্যুত্থানে শঙ্কিত হয়ে য়ুরোপের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ স্বাজাতিক স্বার্থের ধুয়া তুলে উপনিবেশগুলিতে শোষণ ও পীড়ন পূর্ববৎ চালাতে থাকে; যুদ্ধোত্তর সংকট থেকে উদ্ধার পেতে জাত্যভিমানের ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিরোধকে দমন করে নিষ্ঠুরভাবে। তাই যুদ্ধোত্তর শান্তিপ্রয়াস কবিকে আদৌ নিশ্চিন্ত করে না, বরং তার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধিতে শংকিত হয়ে তিনি লেখেন—

"শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিল্‌বিল্‌ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।[২৭]

যুদ্ধের পর কবি য়ুরোপে যান ১৯২০ সালের মে মাসে। সে-যাত্রায় য়ুরোপের নানা দেশে ও আমেরিকায় নানা সভায় জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগ ও বিরুদ্ধতা তিনি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেন, শোনান শান্তির অদ্বিতীয় আশ্রয় সখ্য ও সহযোগিতার মন্ত্র, বলেন পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথা। যুদ্ধে জয়ী অথচ জীর্ণ সাম্রাজ্য-বাদী ফ্রান্সে এক সভায় বলেন—

"আমার কাছে আজ একথা বেশ পরিষ্কার হয়েছে যে পাশ্চাত্য জগতে স্বাধীনতার ভাব বেশ লঘু হয়ে আসছে—তারই ফলে এসব দেশে দাস-ব্যবসায়ীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—যারা অগণ্য পঙ্গু লোককে ব্যবসায়ের ও রাষ্ট্রীয় ঘানিতে বেঁধে চালাচ্ছে।...যেসব লোক তাদের আত্মাকে মুনাফা অর্জনের লোভের কাছে বলি দিয়েছে এবং শক্তিমদে মত্ত হয়েছে তারা একটু বিপদ অনুমান করলেই সন্দেহ ও ভয়ের ছায়া-মূর্তির তাড়া খেয়ে ভয়ংকর নির্মম হয়ে উঠতে পারে...লব্ধ সম্পত্তিকে যে কোনো উপায়ে রক্ষা করার জন্য নিরন্তর দুশ্চিন্তা তাদের মনের ন্যায় ও স্বাধীনতাবোধের এমনভাবে মূলোচ্ছেদ করে দিচ্ছে যে তারা ক্রমাগত

Scanned with CamScanner

নিজের ও পরের জন্য শিকল তৈরি করে চলেছে।”[২৮]

বিদেশ যাত্রার অল্পকাল আগে আমেদাবাদের এক সভায় 'Construction Versus Creation' ভাষণে কবি বলেছিলেন—

"...with the help of science, the possibility of profit has suddenly become immoderate, The whole of human society throughout its length and breadth has felt the gravitational pull of a giant planet of greed with its concentric rings of innumerable satellites. It has carried to our society a distinct deviation from its moral orbit, its mental balance being upset and its aspirations brought down to the dust. ...And what is becoming a constant source of disaster for humanity is the incessant hypnotism of money and its secret action upon the mind. It manufactures opinions, it navigates newspapers through tortuous channels of suppression of truth and exaggeration, it pulls most of the strings of politics, it secretly maintains all kinds of slavery under all varieties of masks."[২৯]

এই কথাই নানাভাবে নানা ভাষণে ও রচনায় তিনি বলেছেন। ধন ও শক্তির একাত্মতায় মানুষের সমূহ সর্বনাশ তিনি দেখেছেন। 'Creative Unity' গ্রন্থের 'Modern Age' প্রবন্ধেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই বক্তব্য।

"মানুষের তো আত্মা আছে, মানুষ তো কেবল একটা টাকার বস্তু নয় যে, মুনাফা থেকে মুনাফান্তরে লম্ফ দিয়ে অন্য মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে চলাতেই সার্থকতা হবে।”[৩০]

এই ক্ষুব্ধ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সের এক সভায়। সেই ১৯২০-২১ সালে আমেরিকা থেকে যেসব চিঠি তিনি এণ্ড্রুজকে লিখেছিলেন সেগুলি তো এই বোধে ও ভাবনায় প্লাবিত হয়েছে বারংবার। ভাষণে ও রচনায় ধনতান্ত্রিক সমাজ নিয়ে যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইতিপূর্বে, তার থেকে ভিন্ন কি অভিনব কিছু ঐসব চিঠিতে বলেন নি। যা আছে চিঠিতে, তাকে সংক্ষেপে বলা যায় অনুভব, মর্মবেদনা, অন্তরঙ্গ অতএব অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ কবি, এক সতত সৃজনশীল সত্তা ব'লে সে-সবের মূল্য কম নয়, বোধ হয় বেশিই। ১৯২০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর

এণ্ড্রুজকে লিখেছিলেন—

"এ দেশে এখন আমি বৃহদায়তনের দুর্গকারায় বাস করছি। আমার চিত্ত উপবাসী। দিনরাত কেবল সেই শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন দেখছি, যা প্রাণের সহজ বিকাশের ক্ষেত্রে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে।...এখানে প্রতিদিন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছি, সংখ্যাদৈত্যের এই বোঝা বয়ে বেড়ানো মানবাত্মার পক্ষে কী ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো। এই দৈত্যটা অনবরতই মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে না। নিরন্তর সংগ্রামের ঝড় ঘনিয়ে তুলে ভবিষ্যৎ বিরোধের বীজ চারি দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।"[৩১]

১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে লিখেছেন—

"স্বাদেশিকতার আবেগ ক্ষুদ্রচেতা মানুষকে মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ থেকে চ্যুত করে। নিজের স্বার্থবোধকে সে এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে যে, তার সঙ্গে ইতরতা নিষ্ঠুরতা লোভ—সবই উগ্র হয়ে ওঠে। দেবতার আসনে নিজের দম্ভকে প্রতিষ্ঠিত করতেও তার বাধে না।

বর্তমানকালে সমস্ত পৃথিবী এভাবে অপদেবতার পূজা করে যাচ্ছে। আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, পাশ্চাত্যদেশে এই বীভৎস পূজার অজস্র উপচার দেখে আমি কত যে বেদনা বোধ করেছি।...জনমনের চোরাবালির উপর এরা মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে রাজনৈতিক সভ্যতার বিরাট সৌধ গড়ে তুলতে চায়। সর্বক্ষণ ঘৃণা বিদ্বেষ ঈর্ষা ও মিথ্যার কারবার নিয়েই এদের জীবন কাটে।"[৩২]

দু' বছর পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'সমবায় ২' প্রবন্ধে লেখেন—

"...আমেরিকা যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহন হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই 'য়ুনাইটেড স্টেটস্'-এ রাষ্ট্র-চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে

Scanned with CamScanner

পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।"[৩৩]

অনেক দিন আগে ইংল্যাণ্ডের কমন্সসভায় প্রথম উপস্থিত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি দেখে তরুণ কবির কেমন আশাভঙ্গ হয়েছিল, তার বিবরণ আছে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'-এ। ধন বা পুঁজির সঙ্গে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্বন্ধটি এখানে যেভাবে পাই তখন অবশ্য সেভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সেই স্পষ্টতা এসেছে অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ভ'রে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে। আজ আশ্চর্য লাগে যখন দেখি—উদারনীতিক রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি ঐ গণতন্ত্রের ভিতরের ফাঁকিটা ধরতে পেরেছিলেন, এবং যেকালে সকলেই গণতন্ত্রের ঐ প্রতিমাটিকে পরমা জেনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছেন, সেকালে তিনি তার মহিমায় আদৌ অভিভূত হন নি, এমনকি বাঁ-হাতেও তাকে পূজা দেন নি।[৩৪]

১৯২৪ সালে জাপানে প্রদত্ত 'International Relations' ভাষণে কবি তাঁর বহুভাষিত বক্তব্যকেই পুনরায় তুলে ধরেন—

"Now that the whole human world has surrendered itself to the lure of money and power, the severance of human relationship is everywhere becoming evident and the fight between classes is spreading wide.

If you must have peace you will have to fight the spirit of this demon, the Nation."[৩৫]

ঐ ভাষণেই পশ্চিমীদের গণতন্ত্র নিয়ে বড়াইকে বলেছেন 'deep-rooted illusion' গণতন্ত্রে নাকি প্রাচ্যের মানুষের আস্থা নেই, সুতরাং তাদের তুলনায় গণতন্ত্রপ্রিয় পশ্চিমের মানুষ শ্রেষ্ঠ—এরকম 'হামবড়া' ভাবের সমালোচনা ক'রে বলেছেন—

"While loudly protesting their democracy, they extort false evidence from a make-believe science to prove their race superiority and their right to inherit the earth. These aristocrats of monstrous girth and open jaws are out to feast upon the life-

blood of peoples whom they have dubbed ignoble, who are expected to feel grateful for providing comfort to the Nordic race with their own extinction. They assert their race aristocracy, not merely through their home-made science, but through the coercion of darker continents to slavery by the shattering arguments of bombs. To-day, they are almost openly ready to drop their pretensions to moral culture ; but nevertheless they cling to their two illusions, the one of the Nordic race, and the other of Democracy."[৩৬]

১৯২৪ সালেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩১) প্রকাশিত হয় 'রক্তকরবী' নাটক, যার সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গের যোগ নিবিড়। প্রায় বছর দুই আগে রচিত ও প্রকাশিত (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯) 'মুক্তধারা'-কেও একই সঙ্গে মনে পড়ে। সব দিক থেকে সদৃশ না হলেও দুটি নাটকেই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা, শোষণ ও পীড়ন, ব্যক্তি ও ব্যবস্থা নিয়ে। নাটক হিসেবে রচনা দুটি সার্থক কিনা অর্থাৎ প্রতীকের নির্বাচন ও প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত কিনা, কিংবা লেখকের ভাবনায় কোথায় অস্পষ্টতা, কোথায় যুক্তির ফাঁক, কোথায় মরমীয়তার সংক্রামে অভিভূত হয়েছে যুক্তি, পুরাণের সংস্রবে আধুনিক সমস্যাটা যথাযথতা থেকে স্খলিত হয়েছে কিনা, ভাবনায়-কল্পনায়-নির্মাণে সর্বাঙ্গীণ সাযুজ্য ঘটেছে কিনা—এসব প্রশ্নের আলোচনার স্থান এটা নয়। আমাদের আলোচ্য লেখকের চিন্তা, তাও অংশবিশেষ।

'মুক্তধারা'তে দেখি শিবতরাইয়ের অবাধ্য ও অধীন মানুষদের ভাতে মেরে শায়েস্তা করছেন উত্তরকূটের রাজা। সেজন্য তিনি তৈরী করিয়েছেন বিশাল এক বাঁধ যা শিবতরাইয়ের জলের উৎসটিকে রোধ করবে। বাঁধটাকেই বলা হয়েছে যন্ত্র। যন্ত্রের এই ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ—যন্ত্রের নয়। যন্ত্র তথা বিজ্ঞান তো মানুষের বহু সাধনার ধন, প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি তো তারই কল্যাণে, এবং অবশ্যই শুধু প্রয়োজনের নয়, গৌরবেরও বস্তু—দিনের আলোর মতো প্রতীয়মান এই সহজ সত্যকে তিনি কারো থেকে কম বুঝতেন না এবং এর মূল্য তাঁর

VISVA-BHARATI
Palli Samgathana Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.....................
Date.....................

কাছে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর আপত্তি ছিল এর অপব্যবহারে, এবং সে-আপত্তি তিনি প্রকাশ করেছেন নানা রচনায়। যে-জাতীয়তাবাদকে তিনি বলেছিলেন অপদেবতা, এ-নাটকে তাই ভর করেছে উত্তরকূটে; যন্ত্ররাজ বিভূতি তারই অনুগত ও সহায়। যদিও প্রচলিত ব্যাখ্যায় যন্ত্র ও মানুষের বিরোধই প্রধান বলে গণ্য হয়েছে, লেখক কিন্তু ঐ যন্ত্রের নেপথ্যে রয়েছে যে অভিসন্ধি, যে শক্তি, তার প্রাধান্য আদৌ প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। শিল্পের জন্য শিল্প, এ-মতে যেমন তাঁর সমর্থন ছিল না, তেমনি সমর্থন ছিল না 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান' এমনি কোনো তত্ত্বে। উভয়কেই তিনি গ্রহণ করেছেন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে। যে ধনতান্ত্রিক পৃথিবীকে তিনি দেখেছিলেন ভিতর থেকে, পরাজাতিবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদের যে বিষাক্ত বাতাবরণে বেঁচে থাকতে হচ্ছিল তাঁকে, সেখানে বিজ্ঞানের স্বার্থান্ধ ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ ব্যবহার, বিজ্ঞানীদের বিবেকহীন নীতিহীন তৎপরতা, তথা রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ—ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে দেখেছিলেন দিনে দিনে। উত্তরকূটের জনৈক প্রজা বলেছে, "ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে সে মিলিয়েছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির।" য়ুরোপের নর্ডিক জাত্যভিমান ও উন্নাসিকতার যে তীব্র সমালোচনা অল্প আগে উদ্ধৃত হয়েছে, এ-নাটকে তাকেও ধরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ইংগিতে। কেন শিবতরাইয়ের লোকেদের জব্দ করবার আয়োজন, রাজা রণজিতের এই প্রশ্নে গুরুমশায় ও তাঁর ছাত্রদের উত্তর লক্ষ্য করবার মতো।—

"গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল্ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাকলে কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

Scanned with CamScanner

নাটক প'ড়ে সন্দেহ থাকে না যে শিবতরাই হল উত্তরকূটের উপনিবেশ। বিজয়ী জাতির দ্বারা সে-দেশ লুণ্ঠিত ও শোষিত হচ্ছে, শত পীড়নেও ফুঁসছে ব'লে তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য কূটনীতি ও বিজ্ঞান ছদিক থেকেই চেষ্টা চলছে। রাজা রণজিৎ ও তাঁর খুড়ো বিশ্বজিতের সংলাপে সেই দুশ্চেষ্টার বিবরণ আছে।—

"বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ । শত্রু দমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ । মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ । যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়, সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।"

যে-বাঁধ নিয়ে এই নাটক তোলপাড় তা তৈরী হয়েছে কাদের শ্রমে? কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সব শ্রমিকদের? বিভূতি জানিয়েছে— "দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি।" "চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি?" —বিশ্বজিতের এই খেদোক্তিকে বিভূতির কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে স্পষ্ট হয়ে যায় গায়ের জোরে উপনিবেশ থেকে সস্তা মজুর আমদানীর ছবিটা। নাটকের শেষ দিকে অনুরূপ গায়ের জোরেই মজুরদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার জন্য। সন্দেহ কি, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাজাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে যে সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ক্লান্তিহীনভাবে মুখর, এ-নাটকে তারই

Scanned with CamScanner

ছবি তিনি এঁকেছেন। এই সঙ্গে অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে, 'মুক্তধারা' একটি প্রতীকী নাটক। প্রতীকী বলেই এর নানা স্তরে বিভাসিত হয় নানা ভাবনা ; যে অর্থ টা ধরা গেল তারই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় না এ-নাটক, বাকি থাকে কিছু, এমন কিছু—যার রণন সন্দেহাতীত এবং যা নিরূপিত অর্থের নিশ্চিতিকে পেরিয়ে গিয়ে উৎসুক ক'রে তোলে তদধিক নিহিতার্থের জন্য। তাই প্রতীকী রচনার ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য স্বাভাবিক।

রচয়িতাই যখন ব্যাখ্যাতা তখনও যে অর্থের নিশ্চিতি স্বতঃসিদ্ধ নয়—সেটা বোঝা যায় 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে নাটকটির উপর রবীন্দ্রনাথ যে আলোকপাত করেছেন তাতে হুবহু মিল নেই, কোথাও কোথাও অমিলও ঘটে গেছে। প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা, প্রচলিত সংস্করণের 'নাট্য পরিচয়', 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এবং 'The Manchester Guardian'-এ প্রকাশিত কবির বক্তব্য—সবাই মিলে নাটকটির অর্থবোধে আমাদের শুধু সহায়তাই করে না, সঙ্গে সঙ্গে জটিলতার দিকেও ঠেলে দেয়। এরকম পরিস্থিতিতে, সব দিক বিবেচনা ক'রে, নাটকে আর ঐসব মন্তব্যে মিলিয়ে, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-আস্বাদন মতো সমালোচককে খুঁজে নিতে হয় গ্রহণযোগ্য অর্থটি। যেহেতু নাট্যকার স্বয়ং ব্যাখ্যাকার হয়ে আমাদের হাতে ধ'রে নিয়ে যেতে চান এই নাটকের মর্মলোকে, সেহেতু তাঁর কথা না শোনা মূঢ়তা। আমাদের মনে হয়েছে, কবির ইংরেজী ব্যাখ্যাটি বাঙলায় রচিত অন্য তিনটির তুলনায় ঋজু ও স্পষ্ট, সুসংবদ্ধ ও সামগ্রিক। তাতে তাঁর বক্তব্য—

"There was a time when, in the human world, most of our important dealings with our fellow-beings were personal dealings, and the professional element in society was never hugely disproportionate to the normal constitution of its life. Therefore, naturally, in the tradition of literature, which is the ideal expression of man's life, interactions of human relationship have so long occupied the most important position.

To-day another factor has made itself immensely evident in shaping and guiding human destiny. It is the spirit of organisation, which is not social in character. But utilitarian...Naturally, in all organisations, variation of personality is eliminated, and

the individual members, in so far as they represent the combination to which they belong, give expression to a common type and very little to their uniqueness of individuality.
But the personal man is not dead, only dominated by the organised man. The world has become the world of Jack and Giant —the Giant who is not a gigantic man—but a multitude of men turned into a gigantic system...
It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European civilisation...Such an objectified passion lacks the true majesty of human nature ; it only assumes a terrifying bigness, its physiognomy blurred through its cover of an intricate network, —the scientific system. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power...
...In a similar manner, the hungry purpose, having science for its steed, running about unchecked, trampling our life's harvest, is not an intellectual generalisation unfit for imaginative literature. It is intensely real ; its hot breath is upon us ; its touch is all over our shrinking soul. It is the principal hero today in the drama of human history ; and I trust I have the right to invoke it in my own play, not in the spirit of politician, but of a poet, possibly a lyrical poet...

I can assure my readers that I never meant to use this book as propaganda. It is a vision that has come to me in the darkest hour of dismay. I have a stronger faith in the simple personality of man than in the prolific brood of machinery that wants to crowd it out. This personality—the divine essence of the infinite in the vessel of finite—has its last treasure-house in woman's heart. Her pervading influence will some day restore the human to the desolated world of man."[৩৭]

কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে যে সত্যকে লাভ করেছিলেন, যাতে উদ্বেজিত হয়েছিল তাঁর কল্পনা, তার মূর্তিটা কতটা সার্থক শিল্প হয়েছে সে-বিচার স্বতন্ত্র, কিন্তু মূর্তিটা যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার, তা প্রচলিত ভাষায় বলে না দিলেও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। বস্তুত, সৃজনশীল সাহিত্য তো দূরের

কথা, প্রবন্ধেও ঐ ভাষায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। এখানে যাকে বলেছেন 'organisation' তা আসলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'The Modern Review' পত্রিকায় 'Organizations' নামে কবির একটি প্রবন্ধ বের হয়। ঐ প্রবন্ধে ঐ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। লোভ, লুণ্ঠন, শোষণ, পীড়ন—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সব দুষ্প্রবৃত্তির ক্ষুরধার সমালোচনা তিনি ক্রমাগত করে এসেছেন; ঐ ব্যবস্থায় মানুষ যে মনুষ্যত্ব থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে খণ্ডিত, চূর্ণ হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব, ঐ ব্যবস্থা যে যান্ত্রিক, নীতিহীন, শক্তিমদমত্ত—একথা তিনি বুঝিয়ে বলেছেন বহুবার। 'রক্তকরবী'তে পাই তারই সজীব প্রতিচ্ছবি। এই ছবি যেহেতু প্রতীকের জটিল রহস্যে মণ্ডিত এক মহাকবির রচনা, সেহেতু এর সবটাই স্পষ্ট হয়ে যায় না বুদ্ধির দৌত্যে। যতটুকু যায়, তাতে মনে হয়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজের উপর এই নাটকই রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম, কেননা সংবেদ্য, আলোকপাত।

"তার পরে আবার তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।"—নন্দিনীর এই কথায় আছে দুটি স্তর; একটিতে আছে তার অভিজ্ঞতা ও প্রতীতি, অন্যটিতে অভিপ্রায় ও প্রতিজ্ঞা। যক্ষপুরীর রাজা কে, কেন তিনি জালের আড়ালে, নাটকের শেষে বাইরে বেরিয়ে এলে কেন তিনি অদৃশ্যই থেকে যান শেষ পর্যন্ত (যেমন শম্ভু মিত্রের সার্থক প্রযোজনায় ও অভিনয়ে)—এ-সব প্রশ্ন নাটকটি পড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে। রাজা অবশ্যই মানুষ, কিন্তু তিনি-যে মানুষ এ-সত্যটা ভুলে গেছেন; ভুলে গেছেন লোভে প'ড়ে। নাটকের রাজা সেই লোভের জালে আটকে-পড়া আত্মবিস্মৃত মানুষ, ভয়ংকর অবমানুষ। এ-মানুষকে চোখে দেখা যায় না কখনো, কেননা এ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। এজন্য নন্দিনী যখন রাজার বর্ণনা দেয় তখন

Scanned with CamScanner

তা কিছুমাত্র বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না ; সে-বর্ণনায় বাণী পায় কেবল রাজার বিরাটত্ব ও প্রবলত্ব, হৃদয়হীনতা ও ভয়াবহতা। কবির কল্পনায় আর ধনতন্ত্রের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় অক্ষরে অক্ষরে মিল খুঁজতে যাওয়া বৃথা এবং অমিল দেখে তার সমালোচনা অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন নিজস্ব দৃষ্টিতে। তাই নাটকের শেষে রাজা অবতীর্ণ হয়েছেন নিজেরই বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, সে-লড়াইতে যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা অগ্রণী ; আর রাজা তাদের অনুগামী সহযোদ্ধা—নির্দ্বিধ ও নিরুদ্বেগ, সম্বুদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ। যে প্রশাসন ও ব্যবস্থা একদা ছিল রাজার অধীন, অধুনা সে-ই হয়েছে প্রভু এবং রাজাকে করেছে তার অধীন। তাই রাজার প্রত্যক্ষ লড়াই তার বিরুদ্ধে। নন্দিনী যে-পথে শ্রমিকদের নিয়ে গিয়েছে সে বিপ্লবের পথ ; কিন্তু কবি যখন রাজাকেও সেই বিপ্লবে সামিল করেন তখন তা শুধু অভিনবই হয়ে ওঠে না, অবিশ্বাস্যও বটে। পুরাণে ও বাস্তবতায় সংগতি কতটা—এ-প্রশ্ন জাগে। অন্যভাবে বললে, মহাকবির দৃষ্টি ও কল্পনা অংশত আমাদের বোধ ও বুদ্ধির অগম্য থেকে যায়। তবু, 'রক্তকরবী' সুনিশ্চিতভাবে আমাদের জাগিয়ে দেয় ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, উদ্বোধিত করে সংগ্রামে এবং আমরা অব্যবহিতভাবে বুঝি—ঐ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা কত জরুরী, কঠিন কিন্তু সম্ভব, আর মানুষের ভবিতব্যও সেটা।

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ ইতালী ভ্রমণ করেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার ঐ উৎসভূমি তখন ফ্যাসিস্ত মুসোলিনীর কঠিন নিষ্পেষণে রক্তাক্ত ও রুদ্ধবাক ; গণতন্ত্র নিহ্নুত, নিহত সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের অনেকেই, অনেকে নির্যাতিত হয়ে প্রাণের দায়ে প্রবাসী ; মানবাধিকার তো দূরের কথা, মানুষের বেঁচে থাকাটাও শাসকদলের ইচ্ছাধীন। মানবতাবাদী, সর্ববিধ দমন-পীড়নের প্রচণ্ড বিরোধী, সখ্য ও সহযোগিতার মন্ত্রগুরু, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বশান্তির প্রচারক কবি যখন ঐ দেশে গেলেন, গ্রহণ করলেন সরকারী আতিথ্য এবং মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে বিস্ময়, সংশয় ও প্রশ্ন জাগল ; বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল।

Scanned with CamScanner

সে-ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য এবং আলোচিত। এখানে শুধুমাত্র ফ্যাসিস্ত ইতালী সম্বন্ধে কবির চূড়ান্ত উপলব্ধি ও ঘোষণাই স্মরণীয় এবং গ্রহণীয়। ইতালী থেকে রবীন্দ্রনাথ সুইজারল্যাণ্ডে রম্যাঁ রলাঁর কাছে যান। রলাঁর প্রযত্নে ও দেশত্যাগী কয়েকজন ইতালীয়ের সান্নিধ্যে এসে মুসোলিনীর ও তাঁর শাসনাধীন ইতালীর যথার্থ পরিচয় ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। নিদারুণ মর্মবেদনায় তখন এণ্ডরুজকে যে পত্র তিনি লেখেন সেটিকে বলা যেতে পারে তাঁর চূড়ান্ত ঘোষণা। তাতে তিনি জানান—

"...the methods and the principle of this Fascism concern all humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience, and walks through a blood-stained path of violence. I have said it over and again that the aggressive spirit of Nationalism and Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the west, is a menace to the whole world. The demoralisation which it produces in European politics is sure to have disastrous effects, especially upon the peoples of East, who are helpless to resist the Western methods of exploitation.

It would be most foolish, if not almost criminal, for me to express my admiration for a political ideal which openly declares its loyalty to brute force as the motive power of civilisation. That barbarism is not altogether incompatible with material prosperity may be taken for granted, but the cost is terribly great—it is fatal. This worship of unscrupulous force as the vehicle of nationalism keeps ignited the fire of international jealousy which is for universal incendiarism in a fearful orgy of devastation."[৩৮]

কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার কারণেই নয়, অন্যদিক থেকেও এই চিঠি গুরুত্বময়। ব্যক্তিস্বাধীনতায় তাঁর গভীর বিশ্বাসের এক ঘোষণা যেমন এই চিঠি, তেমনি এতে বাহুল্যবর্জিত ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় চিহ্নিত হয়েছে সেই জাতীয়তাবাদ—যার বিরুদ্ধে তিনি। আগ্রাসী ও আক্রমণশীল

Scanned with CamScanner

জাতীয়তাবাদ তাঁর আক্রমণের বিষয়। তাকেই তিনি বলেছেন আধুনিক পৃথিবীর সব থেকে বড়ো বিপদ। য়ুরোপে দেখেছেন সেই অপদেবতার উদ্দাম আরাধনা। তার ধ্বজা হাতে নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের জগৎজুড়ে তাণ্ডব। ফ্যাসিবাদ তারই নবকলেবর। ফ্যাসিবাদ বাক্-স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে দলন করে, ব্যক্তিকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে তৎপর হতে বাধ্য করে, হিংসার রক্তাক্ত পথে বিচরণ করে। সে-পথ পাশব শক্তির পথ, বিদ্বেষের পথ, বর্বরতার পথ। এই রাজনীতিকে সমর্থন করা মূঢ়তা তো বটেই—এমনকি অপরাধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অবক্ষয়ী ধনতন্ত্র থেকে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব। সমাজ-তন্ত্রের বৈপ্লবিক বিশ্ববিজয়কে প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করার জন্য, যুদ্ধোত্তর আর্থিক বিপর্যয় থেকে ধনতান্ত্রিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য এই 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে'র সৃষ্টি। এই দস্যু যখন য়ুরোপের দেশে-দেশে প্রবল পরাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে, বেশ কয়েকটি দেশ দখল ক'রে নেয় রাষ্ট্রশক্তি, মানুষের যাবতীয় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে হত্যা করে, তখন গণতন্ত্রের য়ুরোপীয় প্রহরীরা আত্মরক্ষার পক্ষে নির্লিপ্ততাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে। শেষে যখন তাদের স্বপ্নের নিশ্চিন্ততাকে ছত্রখান ক'রে দেয় ঐ দস্যু, তখন একেবারে সর্বনাশের মুখোমুখি এসে শুরু করতেই হয় তার বিরুদ্ধে লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারই নাম। কিন্তু সে আরো পরের কথা। তার আগে বিশ্বের বিবেকী মানুষ ও মনীষীরা এ-বিষয়ে সকলকে সতর্ক ক'রে তুলতে থাকেন, তাঁরা তাঁদের মতো ক'রে শুরু করেন এর বিরুদ্ধে লড়াই। সে-লড়াইয়ে ভারতের প্রধান প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২৭ সালে ফরাসী লেখক ও কমিউনিস্ট আঁরি বারবুস যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন এবং তাতে যোগ দিতে কবিকে আমন্ত্রণ জানান তখন কবি সানন্দে সম্মত হন।

ইতালীর অভিজ্ঞতায় তাঁর চোখ খুলে গিয়েছিল। জাপানী সমরবাদকে তিনি সঠিকভাবে সনাক্ত করেছিলেন অনেক আগেই। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শুরু হতে য়ুরোপে ও এশিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ হয়ে

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No..................

উঠতে থাকে। জাপান প্রায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে। জার্মানীতে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ক্ষমতা দখল করে হিটলার। ফ্যাসিবাদের সেই জয়-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ কেমন শংকাকুল ও যন্ত্রণার্ত হয়েছিলেন, তাঁর বিশ্বাসের ভুবনে কী প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল, তা জানা যায় 'কালান্তর' প্রবন্ধ (জুলাই ১৯৩৩) থেকে। কবি তাতে বলেন—

"যে য়ুরোপ এক দিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজম-এর নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ূরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।...

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যেসব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধ পরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে ? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা ? কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি 'তুমি অশ্রদ্ধেয়' অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়—এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা।"[৩৯]

কবি তখন ফ্যাসিবাদকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখছিলেন, সন্ত্রস্ত মানুষের জন্য কী

ছিল তাঁর বাণী—তা জানা যাচ্ছে এখান থেকে। ফ্যাসিবাদ হল সভ্য মানুষের অসভ্যতা। কবির মতে, বর্বর তার উদ্দেশ্য, বর্বর তার আচার। যাকে বলে সভ্যতা, যা-কিছু নিয়ে সভ্যতা, তার সংহারে সে অলজ্জ ও অকুণ্ঠ, এমনকি গর্বিত। এই বর্বরতাকে বিনিপাত জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সজ্জনের বিনিপাতে বর্বরের কী আসে যায়—এ প্রশ্ন তাঁকে বিদ্ধ করে নি। সভ্যতাকে ধ্বংস করছে যারা, তাদের ধ্বংস করার কথা বলেন নি। বরং সেরকম উদ্যোগকে বলেছেন এক বর্বরতার বিরুদ্ধে আর-এক বর্বরতা। তবে কি ফ্যাসিবাদের বিনাশ তিনি চান নি? চেয়েছেন বৈকি; নইলে বিনিপাত জানাবেন কেন? নির্ভয়ে তার বিরোধিতা করছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে তিনি দেখেছেন মনুষ্যত্বের মহিমা। হয়তো তাঁর মনে মনে হয়ে থাকবে: নিষ্ক্রিয় বিরুদ্ধতা যে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে তাতে উন্মত্ত ফ্যাসিস্টদের চিত্তবদল ঘটবে, অথবা অন্য কোনো শুভঙ্কর প্রক্রিয়ার জন্ম দেবে—যা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি কিন্তু বিশ্বাস করেছেন। যাই হোক, সেজন্য মনে হতে পারে যে, উদ্ধৃত ঘোষণা ওজস্বী ও বীরত্বপূর্ণ হলেও সংগ্রামের শপথ নয়; মনে হতে পারে বড়ো বেশি উদার। কিন্তু যিনি উদারনীতিক তাঁর পক্ষে এই উদারতা তো স্বাভাবিক। তাছাড়া, এই ঘোষণা ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে তাঁর চূড়ান্ত মনোভাবের দলিল নয়।

স্পেনে যখন গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল তখন 'লীগ এগেন্‌স্ট ফ্যাসিজম অ্যাণ্ড ওঅর'-এর ভারতীয় শাখার সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। স্পেনকে রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার সেই আন্তর্জাতিক সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য মানবতার বিবেকের কাছে তিনি আবেদন জানান ('The Statesman', ৩রা মার্চ ১৯৩৭)। সেই আবেদনের শেষে বলেন—

"The devastating tide of International Fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism, of racial prejudice of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism.

At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity.
Help the peoples' front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices 'Halt' to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the succour of civilisation and culture."

১৯৩৩ আর ১৯৩৭-এ কত তফাত! তফাত যেমন বিশ্বপরিস্থিতিতে, তেমনি কবির মনোভাবে। এই গতিশীলতা, উত্তরণশীলতা, অভিজ্ঞতার কাছে এই বিনম্র আত্মসমর্পণ—রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান সম্পদ। অভিজ্ঞতার নাছোড় দাবিতে পূর্বের উদারনৈতিক বিরুদ্ধতা সংগ্রামের সংকল্পে পরিণত হয়েছে। বছর দুই পরে একটি কবিতায় [৪১] গর্ব ক'রে কবি বলেছেন—

"যেথা ওই বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।"

সেই আহ্বানে কিভাবে সাড়া দেন কবি? ঋজু তাঁর উত্তর—

"সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;
সেথায় নির্মম কর্ম;"

এই স্বীকারোক্তি যে আন্তরিক ও অকপট, তা বোঝা যায় ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ও সংগ্রামী ভূমিকা থেকেও। সে-ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবরণ এখানে বাহুল্য। এখানে শুধু দেখে নেওয়া জরুরী তার শীর্ষবিন্দুগুলি, যেখান থেকে জানা যাবে কবির চূড়ান্ত মনোভাব ও অবস্থান। আবিসিনিয়া, স্পেন, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া—একে একে যখন ফ্যাসিস্ট আক্রমণে রক্তাক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথ নির্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকতে পারেন নি। জীবন-মৃত্যুর সীমানা থেকে প্রত্যাবৃত্ত কবি যখন সেই আলোকময়

Scanned with CamScanner

অন্ধকারের অভিজ্ঞতাকে বাণীবদ্ধ করছিলেন প্রগাঢ় উচ্চারণে, তখনই, 'প্রান্তিক'-এর শেষ দুটি কবিতায় শোনা গেল এক ব্যাকুল প্রার্থনা, এক উদ্দীপ্ত ঘোষণা এবং এক আশ্চর্য আহ্বান। একই দিনে রচিত কবিতা দুটি যেন কবির বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে নিষ্ক্রান্ত হল। প্রথমটির মধ্যে পাই পরিপ্রেক্ষিত।—

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল—সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে বিশিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি।"

এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকেন কি করে? কিন্তু কীই-বা করতে পারেন? যা তাঁর পক্ষে সম্ভব, কবির যা সাধ্য, তাই করলেন।—

"মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

Scanned with CamScanner

এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যেদিন সেদিন তারিখটা ছিল ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। 'আফ্রিকা' (মাঘ ১৩৪৩) কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, কবির মনোভাবের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। যীশুর জন্মদিনেও যখন দেখি কবি ধিক্কার জানাচ্ছেন, কিন্তু ক্ষমা করছেন না, তখন যেন স্পর্শ পেয়ে যাই তাঁর তীব্র ক্ষোভের, বহ্নিমান বেদনার। ধিক্কার জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না তিনি; তাতে যে বিপন্ন মানুষ রক্ষা পাবে না—এই কঠিন বাস্তবকেও সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন। তাই সেই দিনই তাঁকে লিখতে হল, বোধহয় অন্তর্গত অশান্তির তাড়নায় লিখতে বাধ্য হলেন, আর একটি কবিতা।—

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

মনে পড়ে, ছবিটা নতুন নয়; শতাব্দীর সূচনায় যে 'নৈবেদ্য' কবি নিবেদন করেছিলেন, তার একটিতে একে পেয়েছিলাম। কিন্তু এই বক্তব্য সেখানে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের কোনো রেখা-চিত্র যদি আঁকা যায়, তবে তার উল্লম্ব রেখার শীর্ষে এই কবিতার স্থান। কবিতা হিসেবে একে হয়তো মহার্ঘ্য বলা যাবে না, কিন্তু কবির নিরুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণ রূপে এর মূল্য অসামান্য।

এ-বিষয়ে এর থেকে অগ্রসর কোনো ঘোষণা রবীন্দ্রনাথ পরে করেন নি। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে দুর্যোগ আরো ঘনিয়ে উঠেছে, ফ্যাসিস্ট মারণযজ্ঞকে স্তব্ধ ক'রে দিতে শান্তিকামী মানুষকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে যুদ্ধ। মানুষজন্তুর হুহুংকার শুনতে শুনতে তিনি যন্ত্রণার্ত হয়েছেন, ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কখনো, কখনো বা অপরাজেয় মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস রেখে সেই ক্ষোভকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। তাঁর

Scanned with CamScanner

সেই বিক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল মনটি নিজেকে নিঃশেষে মেলে দিয়েছে কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রালাপে। ১৯৩৮ সালের ১৪ই এপ্রিল অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লেখেন—

"আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুতগতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাই নে। জগৎ জোড়া গৃধ্নুতার তাড়নায় এক পক্ষে অভ্রভেদী স্পর্ধা অন্য পক্ষে ভূলুণ্ঠিত সেলাম—কী অসহ্য কুশ্রী। ধ্বংস মহাসাগরের মুখের এই ভাঁটার টান একদিন হয়তো থমকে যাবে, একদিন হয়তো উল্টো স্রোতের জোয়ার কল্লোলিত হয়ে উঠবে—সেই শুভ লক্ষণ দেখে যেতে পারব কিনা কে জানে। আমাদের কালের প্রথম যুগে যে সমস্ত শ্রদ্ধার দান অযাচিত দাক্ষিণ্যে আমাদের দ্বারে এসেছিল, আজকের দিনে অট্টহাস্যে তাদের লাথিয়ে ধূলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেচে, সেই সঙ্গে তাদের নিত্যতার সম্বন্ধে মানুষের এতকালের বিশ্বাস একটা শ্বাসরোধকর আঁধির মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে চলল। এর নিষ্ঠুর পরিণাম আজ তো দেখচ পৃথিবীর তিন মহাদেশে—এই বিশ্বব্যাপী আশংকার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈন্যের দিকে তাকিয়ে—এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না—মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে।"[৪২]

মিউনিক চুক্তির অভিঘাতে ক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন কবি অধ্যাপক লেসনিকে যে চিঠি দেন ১৯৩৮ সালের ১৫ই অক্টোবর, তার প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ ভোলবার নয়। কবি লেখেন—

"Dear Friend,

I feel so keenly about the suffering of your people as if I was one of them. For what has happened in your country is not a mere local misfortune which may at the best claim our sympathy, it is a tragic revelation that the destiny of all those

principles of humanity for which the peoples of the west turned martyrs for three centuries rests in the hands of cowardly guardians who are selling it to save their own skins. It turns one cynical to see the democratic peoples betraying their kind when the bullies stand by each other.

I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this, humiliated to see all the values, which have given whatever worth modern civilization has, betrayed one by one, and helpless that we are powerless to prevent it. Our country is itself a victim of these wrongs. My words have no power to stay the onslaught of the mancacs, nor even the power to arrest the desertion of those who erstwhile pretended to be the saviours of humanity. I can only remind those who are not yet wholly demented that when men turn beasts they sooner or later tear each-other."[৪৩]

বিপন্ন মানবতার সঙ্গে এই একাত্মতা, তাদের উদ্ধারে আপন অক্ষমতায় এই হাহাকার, কোনো রাজনৈতিক ভঙ্গি নয়। একে কবিসুলভ ভাবালুতা ভাববারও অবকাশ নেই। সেই সময় এই ছিল তাঁর নিত্য নিগূঢ় অনুভব। এই অনুভবে কেমন প্লাবিত ছিল তাঁর চিত্ত, কী উদ্দাম উৎকণ্ঠায় তাঁর মর্মগত উদারনৈতিকতা ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল কখনো কখনো, তার অন্তরঙ্গ ছবি আছে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে।[৪৪] ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, বিশ্বযুদ্ধ—এক কথায় সমসাময়িক সভ্যতা-সংকট, এই ছিল তাঁর শেষ কয়েক বছরের নিদিধ্যাসন। তার ফলে তাঁর চেতনায় ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়েছে ঈশ্বরের স্থান, বেড়ে গিয়েছে মানুষের ভূমিকা। তাঁর কবিতার মন্ময় জগতেও উদ্‌ঘোষিত হয়েছে 'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা / মাংস গন্ধে মুগ্ধ যারা' তাদের প্রতি ধিক্কার ও অভিসম্পাত, জেগে উঠেছে এই আকাঙ্ক্ষা—'রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান'। কবিচিত্তের এই প্রবৃত্তি যেমন নূতন নয়, তেমনি নয় অগভীর ভাববিলাস। শতাব্দীর সূচনাতেও প্রায় অনুরূপ চিত্তবিক্ষোভ ও প্রতিজ্ঞা আমরা দেখেছি। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য গুণগত ও গুরুতর। একটি হিসেব

হাজির করলে সন্দেহাতীত হয়ে যাবে সেই পার্থক্য। ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছেন ১৪০টি।[৪৫] তার মধ্যে 'ডাকঘর' নাটকের জন্য রচিত 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো গানে ঈশ্বরানুভব নেই। একদা যিনি অজস্র ব্রহ্মসংগীত লিখেছিলেন, আত্মগত ঈশ্বরোপলব্ধিকে যিনি গানে গানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বময়, সেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ তিন বছরে বয়োধর্মকে অস্বীকার করেছেন বিস্ময়করভাবে। যখন ঈশ্বরের চিন্তা একান্ত হয়ে ওঠার কথা, তখন তাঁর গানের প্রধান উপজীব্য প্রেম ও প্রকৃতি। ১৯৩৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মদিনে যে গানটি কবি লেখেন ('একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে') তাতে দেখি ঈশ্বরের থেকেও সমসাময়িক বিশ্বসংকটের ভাবনা বেশি। তাঁর মতো ঈশ্বরভক্তের চেতনায় ঈশ্বরের এই অন্তরালে অপসরণ ইংগিতময় মনে হয়। যে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে তাঁর জন্ম ও জীবনযাপন, সেই বিশ্ব যখন তাঁর চোখের সামনে দিনে দিনে জীর্ণ হয়ে গেল, তখন অনিবার্যভাবেই তাঁর বিশ্বাসের ভুবনে ঘটতে থাকল তার প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে যায় নি তাঁর বিশ্বাসের ভুবন, কিন্তু তার মাধ্যাকর্ষণ আগের মতো সর্বজয়ী আর ছিল না, এবং উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠেছে মানবচিন্তা, মানবমুক্তির ভাবনায় জেগে উঠেছে সমান্তরলতা ও স্ববিরোধ।

মানুষের মধ্যে যাঁরা মানুষ, যাঁরা প্রবুদ্ধ, যাঁরা মহাসত্ত্ব, তাঁদের মধ্যে তিনি দেখেছেন মৃত্যুঞ্জয়কে, দেখেছেন পরিত্রাতাকে; তাঁদের ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গকে গণ্য করেছেন সর্বমানবের উদ্ধারের উপায় রূপে। আবার তিনিই ডাক দিয়েছেন তাঁদেরকে যাঁরা দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হিংসা ও বলপ্রয়োগের ঘোরতর বিরোধী যিনি তিনি এই 'আহ্বান'-ও জানিয়েছেন—

"বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।

ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানবপদদলনে হল গুঁড়া।
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।”[৪৬]

এই ‘আহ্বান’ জ্ঞাপনের একটি উপলক্ষ আছে। ‘এম্পায়ার ডে’ উৎসবে কানাডাকে এই উপহার পাঠান কবি। উপলক্ষ আর উপহারের অসংগতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর উত্তরণশীল রাজনৈতিক চিন্তা—অভিজ্ঞতার অমোঘ শিক্ষায় যা প্রতিবাদ থেকে ক্রমে ক্রমে প্রত্যাঘাতে উত্তীর্ণ।
যে অভিজ্ঞতার পটে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এই স্ববিরোধী উত্তরণ ঘটেছে, সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে উৎসুক ও উৎসাহী ক’রে তুলেছে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে। রেনেশাঁসের উত্তরাধিকার ও জ্ঞানালোকদীপ্ত য়ুরোপের বিশ্বাসের হন্তারক সাম্রাজ্যবাদ সমসাময়িক পৃথিবীতে যে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছিল, তা তাঁর চিন্তায় সংক্রামিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সূচনাবধি, আর জীবনের শেষ দশকে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। মানুষের দুর্গতির এই কালো যবনিকার পটভূমিকায় সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়কে রবীন্দ্রনাথ নূতন যুগের অরুণোদয় রূপে অভিবাদন জানিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. ‘কালান্তর’—রচনাবলী (১৩)। পৃঃ ২১২
২. নৈবেদ্য : ৪৭—রচনাবলী (১)। পৃ. ৮৮২

Scanned with CamScanner

৩. তদেব : ৬৪—তদেব। পৃ. ৮৯০

৪. তদেব : ৬৬—তদেব। পৃঃ ৮৯১

৫. তদেব : ৯২—তদেব। পৃ. ৯০৩

৬. রচনাবলী (১২)। পৃ. ১০৫৯

৭. তদেব। পৃ. ৮৮২-৮৩

৮. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ২৩১

৯. রচনাবলী (১২)। পৃ. ২২৫-২৬

১০. রবীন্দ্রজীবনী (২), ১৯৬১, পৃ. ৪৫৬-৫৭

১১. Lectures and Addresses, 1970. P. 135

১২. Nationalism, 1976, P. 5

১৩. তদেব। পৃ. ৮

১৪. তদেব। পৃ. ৬৬

১৫. তদেব। পৃ. ১২

১৬. তদেব। পৃ. ১৬

১৭. তদেব। পৃ. ১৫

১৮. তদেব। পৃ. ১৭-১৮

১৯. তদেব। পৃ. ২৬

২০. তদেব। পৃ. ৩৩-৩৪

২১. তদেব। পৃ. ৩৬

২২. তদেব। পৃ. ৫১

২৩. তদেব। পৃ. ৭৩

২৪. তদেব। পৃ. ২৫

২৫. তদেব। পৃ. ১৯

২৬. "Nationalism is essentially an anti-feeling, and it feeds and fattens on hatred and anger against other national groups and especially against the foreign ruler of a subject country."
—Autobiography, 1982, P. 75

২৭. 'বাতায়নিকের পত্র'—রচনাবলী (১৩)। পৃ. ২৮০

২৮. বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, ১৯৮৩। পৃ. ১৫৫

২৯. Lecturers and Addresses. P. 67

০৮১'০৯:৬
৩৫-৮৮ (?)

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.........
Date.........

K07814

P.S.V. LIBRARY, SRINIKETAN
VISVA-BHARATI
ACCESSION NO.- BG 219

Scanned with CamScanner

৩০. বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ১৫৭

৩১. রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, ১৯৬০। পৃ. ৫৯

৩২. তদেব। পৃ. ৭৬

৩৩. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ৪২১

৩৪. "In a society, where the greed of an individual or of a group is allowed to grow uncontrolled, and is encouraged or even applauded by the populace, democracy, as it is termed in the West, cannot truly realised. In such an atmosphere a constant struggle goes on among individuals to capture public organisations for the satisfaction of their own personal ambition. Thus democracy becomes like an elephant whose one purpose in life is to give joy rides to the clever and to the rich. The organs of information and expression, through which opinions are manufactured, and the machinery of administration, are openly or secretly manipulated by the prosperous few, by those who have been compared to the camel which can never pass through the needle's eye, that narrow gate that leads to the kingdom of ideals. Such a society necessarily becomes inhospitable, suspicious, and callous towards those who preach their faith in ideals, in spiritual freedom. In such a society people become intoxicated by the constant stimulation of what they are told is progress, like the man for whom wine has a greater attraction than food."—'The Robbery of the Soil', Introduction by Rabindranath Tagore—Poet and Plowman—L.K. Elmhirst, 1975, P. 35

৩৫. Lectures and Addresses. P. 130-31

৩৬. তদেব। পৃ. ১৩৩

৩৭. গ্রন্থপরিচয়, রক্তকরবী।

৩৮. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (২)—নেপাল মজুমদার। পৃ. ৩৩২-৩৩

৩৯. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ২১৫-১৬

৪০. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (৪)। পৃ. ১৬৪

৪১. 'রোম্যান্টিক'—নবজাতক।

৪২. চিঠিপত্র (১১)। পৃ. ২১৪-১৫

৪৩. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (৫)। পৃ. ২২

৪৪. চিঠিপত্র (১১)। পত্র সংখ্যা ১১৭, ১১৮, ১২৭, ১২৯

৪৫. গীতবিতান, কালানুক্রমিক সূচী (২)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪৬. 'আহ্বান'—নবজাতক। রচনা ১লা এপ্রিল ১৯৩৯

Scanned with CamScanner

বৃত্তান্ত

সমাজতন্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচর্চায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা নেই। সূচনায় তা আকস্মিক, অসংলগ্ন ও অগভীর—যেন প্রক্ষিপ্ত। পরেও বিষয়টি তাঁর কাছে অবাধ প্রশ্রয় পায় নি ; আর, ঐকান্তিক মনোযোগ কখনোই না। তাঁর মনের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁর চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও স্বভাবের ভূগোল যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে এও জানেন যে আদৌ তা সম্ভব ছিল না। এ-বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য জেগেছে প্রধানত পরোক্ষে এবং বিরোধসংকুল পথে। সমাজতন্ত্রের দ্বারপ্রান্তে তিনি পৌঁছেছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে—মানবচিন্তার নানা সূত্রে, লোকহিতব্রতের প্রবর্তনায় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অমানবিক পরিণামের আঘাতে আঘাতে।

তাঁর রচনায় সমাজতন্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাই 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে'। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ঐ ডায়ারীর 'ভূমিকা' অংশে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

"...নতুবা যে সভ্যতা পরিবার-বন্ধনের অনুকূল সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্ নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয় ? সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্ কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে ? যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী সার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনি সন্ধ্যাবেলায় ঐ শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।"[১]

বলা বাহুল্য, সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ও সহানুভূতি থাকলে কারো পক্ষে তাকে 'নাইহিলিজ্‌ম্'-এর সমধর্মী মনে করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সাম্যবাদকে হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে তুলনা করা। তবু এই মন্তব্যের একটা

ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সমাজতন্ত্র কি সাম্যবাদ রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য ছিল না ; য়ুরোপীয় সমাজের পরিবার-বন্ধনের শিথিলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। এ-থেকে তাই আঁচ করা যায় তাঁর প্রাথমিক মনোভাব, যা নিঃসন্দেহে প্রতিকূল—এমনকি, বিদ্বেষে পূর্ণ। যা তিনি সঠিক জানেন না, যা সরাসরিভাবে তাঁর আলোচনায় আসে না, তার সম্বন্ধে এই অবান্তর মন্তব্য প্রমাণ করে যে, বিদ্বেষ বেশ গভীর ছিল। কিন্তু কেন ?

বিলেত যাবার আগে দেশে থাকতেই কি এই বিদ্বেষ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল ? মনে হয় না। কারণ তাঁর রচনাবলীতে সেরকম কোনো ইংগিত নেই। তা ছাড়া সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ এদেশে তখন কতটা আগ্রহ জাগিয়েছিল তাতে সন্দেহ আছে। রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রাম-মোহনের সংযোগ ও বিতর্ক হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু রামমোহন এ-বিষয়ে কিছু লেখেন নি। সাম্যবাদ নিয়ে বাঙলায় প্রথম আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'সাম্য' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তার আগে ঐ বইয়ের তিনটি অংশ তিনটি প্রবন্ধ রূপে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বদলেছিল, 'সাম্য'কে তিনি ভুল বলেছিলেন। মিল ও রুসোর চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিম 'সাম্য' রচনা করেছিলেন। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের একাধিক ভাবুকের চিন্তা তিনি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন এবং সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন 'ইন্টারন্যাশনল'-এর। সুতরাং মার্ক্‌স প্রতিষ্ঠিত (১৮৬৪) প্রথম আন্তর্জাতিকের খবর তিনি জানতেন। তবে মার্ক্‌সের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোনো প্রমাণ নেই। 'বঙ্গদর্শন' ও বঙ্কিমসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'সাম্য' পড়া ছিল—একথা ধ'রে নেওয়া যায়। কিন্তু 'সাম্য' প'ড়ে কারো মনে ঐ মতবাদ সম্বন্ধে বিদ্বেষ জাগতে পারে—ভাবা যায় না। অতএব অন্য কারণ সম্ভবত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডে যান ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। সেখানে পৌছন ১০ই সেপ্টেম্বর এবং সেখান থেকে গৃহাভিমুখে পুনর্যাত্রা

VISVA-B...
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.........................

করেন ৯ই অক্টোবর। অর্থাৎ মাত্র এক মাস তিনি সেখানে ছিলেন। ঐ এক মাসে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি কি কিছু শুনেছিলেন? অসম্ভব নয়। কেননা বৃটেনে তখন একদিকে বেকারীর প্রবল বৃদ্ধি ঘটেছে ও অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন চলেছে। সে-আন্দোলনে সমাজতন্ত্রীদের নানা গোষ্ঠী ছিল এবং শ্রমিক আন্দোলনে তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় Socialist Democratic Federation এবং তাই ভেঙে Socialist League ও Labour Emancipation League; স্থাপিত হয় Fabian Society; প্রবর্তিত হয় শ্রমিকদের ভোটাধিকার দান ক'রে Reform Act। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বার্নার্ড শ সম্পাদিত Fabian Essays in Socialism। বস্তুত বৃটেনে তখন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটছিল।[২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে মনে হয়, ঐ পুনরুজ্জীবনের কোনো আলো ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে তাঁর চেতনায় প্রতিফলিত হয় নি, বরং ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়তো কিছু তিনি শুনে থাকবেন। নইলে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্যের কোনো কারণ মেলে না।

এই অনুমান অমূলক নয়। ধনতন্ত্রের সৌধের ভিত্তিমূলে অসহ্য দারিদ্র্য যে তাঁর চোখে পড়েছিল সে-কথা তিনি স্পষ্ট বলেছেন ডায়ারীতে। কিন্তু সামাজিক সাম্যের ভাবনা তাঁর মনে তখন জাগে নি; তিনি তখন প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যের অনুরূপ সমাধানের কথা ভেবেছেন।[৩] দেশে ফেরবার কিছুদিন পর ১২৯৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁর তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়। সেগুলি হল—'কর্মের উমেদার', 'স্ত্রী মজুর' ও 'ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্‌'। শেষ দুটি রচনা 'সাময়িক সারসংগ্রহ' পর্যায়ে লেখা। বিলেতি পত্রিকা প'ড়ে এই দুটি তিনি লিখেছিলেন। প্রথম দুটি রচনায় য়ুরোপের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন আলোচিত হয়েছে। তৃতীয়টির বিষয় নামেই প্রকাশ। কয়েক মাস আগে ডায়ারীতে যে বিদ্বিষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল এতে তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ইতিমধ্যে বিলেতি পত্রিকা মারফত যতটুকু তিনি জেনেছিলেন তাতেই

Scanned with CamScanner

তাঁর মত পাল্টেছে কিনা জানা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে যে, বিদ্বেষের অবসান হয়েছে। উপরন্তু তাঁর কৌতূহল জন্মেছে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—

"য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিস্ট্ নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ বলিতেছেন, বর্তমান কালে এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্যদিকে সভ্যতার সমস্ত সুখ সম্পদ সাধারণের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।......

এতকাল এই সোশ্যালিজ্ম্ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট্ পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাতপ্রকাশ করিতেছেন।...

ইহা একটা লক্ষণস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজ্মের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাহারা এমন বালুকার পরে কখনই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।"[৪]

বলা বাহুল্য, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা এখানে কিছু নেই। কিন্তু য়ুরোপীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত লক্ষ্য করবার মতো। 'সোশ্যালিজমের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি'র ইঙ্গিত তাঁকে আগের মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে নি; ভাষায় তাই উগ্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ফিরে আসে নি।

Scanned with CamScanner

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনা'য় তিনি 'সোশ্যালিজম' নামে আবার একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত-ভাবে উপস্থাপিত করেন। এবারেও নিজের চিন্তা-ভাবনা তিনি উপস্থিত করেন নি, বেলফর্ট ব্যাক্‌সের একটি বই থেকে সাহেবের অভিমত উদ্ধৃত করেন। তবে, প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, এ-বিষয়ে তিনি আগের থেকে বেশি ওয়াকিবহাল এবং সতর্ক। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি লেখেন—

"সোশ্যালিস্টদিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা নহে, এই কারণে, তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে। আমরা এস্থলে বেলফর্ট ব্যাক্‌স্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।"[৫]

কে এই বেলফর্ট ব্যাক্‌স্? সমাজতন্ত্রের নানা মুনির মধ্যে তাঁর গুরু কে? সাহেবের পুরো নাম Ernest Belfort Bax (1854-1926)। প্রধানত জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে Socialist Democratic Federation-এ যোগ দেন।[৬] মার্ক্‌সের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তাঁকে ঠিক মার্ক্‌সবাদী বলা যায় না। কবি-শিল্পী William Morris-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ফেডারেশনের ভাঙনের পর তাঁরা Socialist League গঠন করেন। দুজনে যুগ্মভাবে রচনা করেন 'Manifesto of the Socialist League' এবং 'Socialism, its Growth and Outcome; ব্যাক্‌সের একক রচনার মধ্যে দুটি হল 'The Religion of Socialism' (1886) এবং 'Ethics of Socialism' (1889)। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এরই একটি পাঠ ক'রে 'সোশ্যালিজম্' প্রবন্ধটি লেখেন। সাহেবের মত সংকলন ক'রে তিনি লিখেছেন—

"—তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল; তাঁহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই 'লিবারালিজম্' বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বাধীন অর্থ সঞ্চয় এবং সম্পত্তি

Scanned with CamScanner

উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারালদের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজম্ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজম ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানবসাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।...

সোশ্যালিস্টরা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন ও বন্টন সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থায় সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট, নয় মর' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।...

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, অতএব নির্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য সোশ্যালিস্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।...

সোশ্যালিজম্ সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে

Scanned with CamScanner

একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে, মানবসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।”

এখন প্রশ্ন, কয়েক মাসের মধ্যে পর পর দুটি রচনায় সমাজতন্ত্র, তা যেভাবে এবং যতটুকুই হোক, আলোচিত হল কেন? ‘সোনার তরী’র কবিতা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এগুলি লেখা। কোথায় তাঁর কবিতা, আর কোথায় সমাজতন্ত্র! তবে কি ‘আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে”—এই কথায় কোনো ইংগিত আছে? এটুকু অন্তত স্পষ্ট যে, বিলেতি পত্রিকার কথাটা তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন নি। সেই বিপ্লব সম্বন্ধে, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কি, এ-প্রশ্ন স্বাভাবিক। অনুকূল নয়। প্রবন্ধের সূচনায় তার ইংগিত আছে। “বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিস্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে।” আন্দোলনকে যদি বলা হয় ‘উপদ্রব’, তবে লেখকের মনোভাবকে নিরাসক্ত কিংবা অনুকূল বলা যায় না। অবশ্য আগের থেকে তা যে বদলেছে তার সুনিশ্চিত প্রমাণ এই বাক্য—“অতএব সোশ্যালিজম্ মতটা কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।” ডায়ারীর বিদ্বেষের এই দ্রুত পরিবর্তন, এই কৌতূহল—চোখে পড়ে বৈকি!

সমাজতন্ত্রের কথা আবার তাঁর মনে পড়েছে বছরখানেক পর। কবি তখন জমিদার, শিলাইদহে জমিদারীর কাজে লিপ্ত। জমিদারের মনে সমাজ-তন্ত্রের ভাবনা দেখে আশ্চর্য লাগে। কিভাবে তাঁর চিন্তায় সমাজতন্ত্র সংক্রামিত হয়েছিল এবং তাতে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, সে-আলোচনায় প্রবেশ করবার আগে পরিপ্রেক্ষিতটা জানা দরকার।

উনিশ শতকের শেষ দশকটি তাঁর চেতনার ক্রমবিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এই সময়েই তাঁর মানবপ্রেম নিছক ভাবাদর্শ হয়ে আর রইল না, হয়ে উঠল বাস্তবিক। এই সময়েই তাঁর জীবনে ঘটল বাস্তবের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বিলেত থেকে ফেরবার পর তাঁর কাঁধে চাপে জমিদারী। তারই দায়ে তাঁকে যেতে হয় পূর্ববঙ্গে। জমিদারীর কাজ তাঁকে

উত্তরোত্তর প্রজাসাধারণের সঙ্গে প্রাণময় সম্পর্কে বেঁধে ফেলে। বাসা বাঁধেন সেখানে। কলকাতার ধনীর দুলাল এবং স্বপ্নবিলাসী কবি উনত্রিশ বছর বয়সে প্রথম পান বাঙলার বিচিত্র জনজীবনের সান্নিধ্য। সে-সান্নিধ্য তাঁকে যা দেয় তা তাঁর পক্ষে পারমিক। ভাবুকের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় বিশাল দেশ, বিশাল এক কর্মক্ষেত্র। তাঁর চিন্তায়, কল্পনায়, সমুত্থিত হয় দেশ-কালের অধীন অসহায় অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ। কবি পান লোকজীবন, লোকধর্ম, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অমৃতের আস্বাদ। লোকযাত্রার সংস্পর্শে এসে তাঁর মানবচিন্তা পায় বাস্তব ভিত্তি, বিমূর্ত ভাবোচ্ছ্বাসের বদলে সে-চিন্তা সার্থকতা খোঁজে দেশ-কালের বাস্তবতায়। তাঁর পরবর্তী পল্লীসংগঠন কর্মের বিস্তৃত উদ্যোগের সূচনা তখন থেকেই। আত্মমুখীন কবি বৃহৎ সমস্যাসংকুল জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেন, সঁপে দিলেন নিজেকে সাধারণের মধ্যে, কঠিন আত্মবিরোধের মধ্য দিয়ে যেতে যেতেও বরণ ক'রে নিলেন লোকহিতব্রতকে। জমিদাররূপে প্রজাদের সম্মুখীন হবার পর থেকে চিন্তা ও কল্পনাকে তিনি কর্মে রূপ দিতে চাইলেন। ফলে, জন্মান্তর ঘটে গেল তাঁর। তখন থেকে আমৃত্যু কবি ও কর্মীর সহযাত্রায় বিচ্ছেদ ঘটে নি কখনো।

একটা কথা এখানে স্পষ্ট ব'লে নেওয়া ভালো। রবীন্দ্রনাথ জমিদারীতে গিয়েছিলেন জমিদার রূপেই; যত দিন সে-কাজে লিপ্ত ছিলেন ততদিন তাঁর কোনো শৈথিল্য ছিল না। জমিদারীতে দানসত্র খোলবার ইচ্ছে যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচেষ্ট ছিলেন জমিদারী-শোষণের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে একটা ন্যায়-নিষ্ঠ সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ছিল। অবশেষে সেই আস্থাও একদিন চলে যায়, কিন্তু সে অনেক পরের কথা। শ্রেণীস্বার্থের প্ররোচনায় স্বদেশের প্রাণ সংহারের বদলে জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমে ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার জীর্ণ প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করতে কি করেছিলেন, তার বিবরণ এখানে বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণীস্বার্থ কি শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন দায়িত্ব গ্রহণের

শুরু থেকেই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি জমিদার হিসেবে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে প্রথম উপস্থিত হন। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী সকলের বসবার ব্যবস্থা হত ঐ অনুষ্ঠানে। সেবারেও তেমনি হয়েছিল। কিন্তু জমিদারী আমলা ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রজাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সেদিন সেই সামন্ততান্ত্রিকতাকে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন ; আসনের শ্রেণীভেদ তুলে দিয়ে সকলকে নিয়ে একত্র বসেছিলেন।[৭]

ঘটনাটা যেন প্রতীকী। জমিদার সেদিন তাঁর উচ্চ মঞ্চ থেকে সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন—

"আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে ; কোনোমতে একটু-খানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখ-মোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে।"[৮]

এটি একটি চিঠি এবং এর তারিখ ১০ই মে ১৮৯৩। ইতিপূর্বে আলোচিত রচনাগুলির থেকে এর গুরুত্ব অধিক। কেননা এটি তাঁর মনের কথা। প্রবন্ধে ও পত্রে লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

Scanned with CamScanner

প্রবন্ধের মতো যুক্তির নিশ্চিত আশ্রয়, সুবিন্যস্ত উপস্থাপনা পত্রে থাকে না। নদী যেমন আপন বেগে চলে, পত্রলেখকের মনও তেমনি। লেখকের আত্মপ্রকাশ এখানে অকুণ্ঠ, অবারিত ও অন্তরঙ্গ। প্রবন্ধে তিনি য়ুরোপের পরিপ্রেক্ষিতে য়ুরোপীয় চিন্তাকে বুঝতে চেয়েছিলেন, নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করেন নি। এখানে পরিপ্রেক্ষিত ভারত—আরো নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় বাঙলা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিষ্পেষণ যেখানে ভয়াবহ সত্য, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই বন্দোবস্তের দৌলতে যেখানে প্রভু। ফলে অনাত্ম চিন্তাচর্চার বদলে এখানে পাই আত্মগত ভাবনা। এখানে প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল চাষী প্রজাদের প্রতি তাঁর মমতা। মমতা শোষণের উপশম ঘটায় না সত্য, কিন্তু ঐ মমতা না থাকলেও তা হয় না। মমত্ব থেকে জেগেছে ভাবনা। সমস্যাটা তাঁর কাছে বৌদ্ধিক নয়—প্রবলভাবে বাস্তব, সজীব। সমাধানও তাঁর ঈপ্সিত। সমাধান কি? সমাজতন্ত্রীরা একভাবে সমাধানের কথা বলেন। সেটা সম্ভব কিনা ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি। অন্য কোনো সমাধানের ভাবনা তাঁর মনে জাগে নি। সম্ভবত জানা ছিল না। তাই, দুঃখের সঙ্গে তাঁর মনে হয়—সমাজতান্ত্রিক সমাধান যদি অসম্ভব হয় তবে 'বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য!' স্পষ্টই, এ-চিঠি লেখার সময় তাঁর কাছে সমাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প ছিল না। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট বুঝি, জমিদার হলেও কবির প্রাণ তখন কি চেয়েছিল। এই চাওয়া শুধু চাওয়াই, একটা তাৎক্ষণিক প্রৈতি মাত্র। এ কোনো প্রত্যয়ে পরিণতি পায় নি। তা যদি পেত তবে তার পরিচয় থাকত পরবর্তী রচনায়।

সে যাই হোক, এখানে কিরকম সমাজতন্ত্রের ইঙ্গিত মেলে? কবি চেয়েছেন, মানুষের দুঃখমোচনের জন্য 'মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা' করুক। বিপ্লবী প্রলেতেরিয়েতের বদলে মানুষের উন্নত অংশের অবিশ্রাম চেষ্টার কামনা বুঝিয়ে দেয় যে, সমসাময়িক বৃটেনের সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর কিছুটা পরিচয় ছিল; কিন্তু মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে নি, কিংবা সে-তত্ত্ব তাঁর মনে

Scanned with CamScanner

ধরে নি। আরো একটা কথা। যে দুঃখমোচনের জন্য তাঁর প্রাণ উৎসুক, সে-দুঃখের মূল কোথায়—এ-প্রশ্নও এখানে তিনি তোলেন নি। সমাজতন্ত্রীরা ধনের যে সুষম বণ্টনের কথা বলেন তার সঙ্গেও সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রকাশ পায় নি; বিপরীত ঝোঁকে তাঁর স্ববিরোধ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন—

"বিধাতা আমাদের একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।" সব মিলিয়ে তাঁর মনের দোটানা বেশ বোধগম্য।

উনিশ শতকে সমাজতন্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তা এইটুকুই। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩—এই তিন বছরে প্রধানত বৃটিশ চিন্তার সংস্পর্শে এর উন্মেষ। পরিমাণ কি গুণগত বিচারে এর মূল্য বেশি নয়। কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, চেতনার অগ্রগতি তুচ্ছ করবার মতো নয়। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'-তে দেখেছি বিরাগ ও বিদ্বেষ; 'সাধনার' পাতায় সে-বিদ্বেষ বিবাগী, বিরাগের বদলে জন্মেছে কৌতূহল; আর 'ছিন্নপত্রাবলী'র একটি পত্রে প্রকাশ পেয়েছে অনুরাগ ও আগ্রহ।

২

ইতিপূর্বে যেমন, তেমনি পরেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজতন্ত্র এক প্রক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ। অর্থাৎ, মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর প্রবহমান চিন্তা থেকে বিষয়টি স্বসমুত্থিত হয় নি। এ নিয়ে তাঁর কোনো নিয়মিত চিন্তা-প্রয়াস নেই; তাঁর চেতনার গভীরেও সঞ্চারিত হয়ে যায় নি এই তত্ত্ব। অবশ্য মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার দাবিও তখনও পর্যন্ত আমাদের জাতীয় দাবি হয়ে ওঠে নি। উনিশ শতকের অন্তিম দশকে তাঁর মনে সমাজতন্ত্র চকিতে প্রবেশ করেছিল—যেন এক দূরাগত অস্পষ্ট কিন্তু মধুর ধ্বনির মতো। তাই বিশ শতকের সূচনায় তার ক্ষীণতম অনুরণনও

শোনা যায় না। বস্তুত রুশ দেশে বিপ্লব সফল হবার আগে এদিকে তাঁর আর নজর পড়ে নি।

'পূরবী' কাব্যে 'বিজয়ী' নামে একটি কবিতা আছে। ঠিক কোন্ তারিখে সেটি রচিত হয়েছিল জানা যায় নি; তবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে।[৯] অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে। বর্তমান প্রসঙ্গে কবিতাটি স্মরণযোগ্য এবং তার অংশ-বিশেষ উদ্ধার যোগ্য—

"তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্ত-ধূলির পথ-বিপথে।...

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে,—
অন্ধকারের ঊর্ধ্ব তলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তারা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তারা, এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রাণীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।"

এই বর্ণনা স্পষ্টই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা। উদ্ধৃত অংশের শেষ পঙ্‌ক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মর্মকথাটি আছে। একথা কবি নানা সময়ে নানা রচনায় বলেছেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ভেবেছিল, জাতিপ্রেমের মশালের

Scanned with CamScanner

আগুনই নিত্যকালের আলো হয়ে জ্বলবে। কিন্তু তা হল কই ? কবিতার শেষ স্তবকে কবি বলেছেন—

"শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন আগে।
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে ;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।"

রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ভিন্ন এ-অংশের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। অবশ্য একথা ঠিক, কবি স্পষ্ট ক'রে রাশিয়া অথবা সমাজতন্ত্র কারো কথাই বলেন নি। যুদ্ধের ভিতর থেকে নব যুগের অরুণোদয় ঘটবে কবির এই বিশ্বাস ও স্বপ্ন নতুন নয়। এখানেও সেই বিশ্বাস পুনরাবৃত্ত। কিন্তু শুধুই কি তাই ? অতিরিক্ত কিছু ইংগিত কি কবি এখানে দেন নি ? মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে ব'লে ঐ অন্তিম স্তবকের কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

যেহেতু এটি কবিতা সেহেতু পাথুরে প্রমাণের আশা করা ঠিক হবে না। কবিতা ব'লেই মনোযোগী হতে হবে এর শব্দ ও অর্থের নিবিড় দাম্পত্যে, ধরতে হবে ব্যঞ্জনা। ক্রিয়ার কাল এখানে ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান—ঘটমান বর্তমান। এতদিন কবি কল্পনা করেছেন, মনে মনে লালন করেছেন এই বিশ্বাস যে, আত্মঘাতী যুদ্ধই শেষ কথা নয়, সেই ভস্মরাশি ভেদ ক'রে জন্ম নেবে নতুন যুগ, নতুন মানুষ। এখানে সেই কল্পনা নেই ; আছে সেই কল্পনা যখন সত্য হয়ে উঠছে তার বর্ণনা। তাই বলেছেন—'শূন্যে নবীন সূর্য জাগে'। কবির কোনো সন্দেহ নেই যে, এ এক নবীন সূর্যোদয়। অক্টোবর বিপ্লব যদি সূর্যের প্রতীকে বাণী পেয়ে না থাকে তবে তা কি ? সমসাময়িক কালে অন্য সূর্যোদয় ঘটে নি। 'জাগে' ক্রিয়াপদটিতে দৃষ্টি দিলে আশ্চর্য হতে হয় নানা কারণে। মাত্র ছ'মাস আগে যে বিপ্লব হয়েছে তার সম্বন্ধে কোনো চূড়ান্ত ঘোষণা কবি করেন নি। কিন্তু তিনি

নিঃসন্দেহ যে এই বিপ্লব এক নবযুগের সূচনা। এই কারণেই বোধ হয় সিদ্ধান্ত-বাক্যটিকে শেষ স্তবকের সূচনায় স্থাপন করেছেন, তার পর অগ্রসর হয়েছেন তার চরিত্রোদ্ঘাটনে। রুশ বিপ্লবের কতটুকু তিনি তখন জানতেন? কতটুকু জানা সম্ভব ছিল? তবু কিন্তু কবি ঐ বিপ্লবের কেতনকে বিশেষিত করেছেন 'বিশ্ব-চেতন' রূপে। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্ত ঐ বিপ্লবের বিশ্বজনীন বাণী কী চমৎকার ধরা পড়েছে তুটিমাত্র শব্দের যোগে! অনেক দিন পরে, ১৯৩০ সালে, রাশিয়ায় গিয়ে এই কথাই লিখেছিলেন একটি চিঠিতে।—

"আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।[১০]

প্রশ্ন উঠতে পারে, কবি যে সূর্যোদয়কে অভিবাদন জানালেন সে কি তাঁর এতকালের স্বপ্ন ও বিশ্বাসের অনুরূপ? এর কোনো উত্তর এখানে নেই। এখানে এইমাত্র জানি যে, এর জন্য কবি আনন্দিত ও আশায় উদ্দীপ্ত। তা যদি সত্য না হয় তবে শেষ তুই পঙ্‌ক্তির জয়ধ্বনি হয়ে যায় অর্থহীন।

'বিজয়ী' কবিতার এই ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে মাস-তুই পরে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধতে। 'Modern Review' পত্রিকার ১৯১৮ সালের জুলাই সংখ্যায় 'At the Cross Roads' নামে কবির একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সেই প্রবন্ধে রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, ও সে সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ভাবনা রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত করেন। তিনি লেখেন—

"At the present moment the World Drama is at the change of its acts, and we do not know towards what denouement it is moving......

We must bear in mind that European civilisation, which is based on militant Nationalism is on its trial in this war. We do not know what is going to be the end of it; for this may not be the last of such wars in Europe......

This is an age of transition. The Dawn of a great Tomorrow is breaking through its bank of clouds and the call of New Life comes with its message that man's strength is of the spirit, and

not of the machine of organisation......

We have heard that Modern Russia is floundering in its bottomless abyss of idealism because she has missed the sure foothold of the stern logic of Real Politik. We know very little of the history of the present revolutlon in Russia, and with the scanty materials in our hands we cannot be certain if she, in her tribulations, is giving expression to man's indomitable soul against prosperity built upon moral nihilism. All that we can say is that the time to judge has not yet come—especially as Real Politik is in such a sorry plight itself. No doubt if Modern Russia did not try to adjust herself to the orthodox tradition of Nation-worship, she would be in more comfortable situation to-day, but this tremendousness of her struggle and hopelessness of her-angles do not, in themselves, prove that she has gone astray. It is not unlikely that as a nation, she will fail, but if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade like the morning star only to usher in the sunrise of the New Age."

কবিতার শিল্পিত শরীরে রমণীয় অবগুণ্ঠন আছে ব'লে অসম্ভব নয় মত-বিরোধ ; কিন্তু প্রবন্ধের অনবগুণ্ঠিত বক্তব্যে সকল মতপার্থক্যের অবসান হওয়া উচিত। পতাকা ও সূর্যোদয়ের ছবি এখানেও উপস্থিত ; তবে প্রবন্ধের নিজস্ব নিয়মেই ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুক্তি, সতর্ক ও সূচীমুখ পর্যবেক্ষণ, এবং পটভূমির যথাযথ উন্মোচন। সন্নিহিত সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে সমাজতন্ত্র নিয়ে ভাবিত ছিলেন এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। তাঁর মন উদ্বেগে আকুল ছিল বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে এবং তারই জন্য তিনি সন্ধান করেছেন যুদ্ধের মূল। রাশিয়া সম্বন্ধে কিরকম সংবাদ তখন তাঁর গোচরে এসেছিল তার ইংগিত তিনি দিয়েছেন উদ্ধৃত শেষ অনুচ্ছেদটির প্রথম বাক্যে। তবু কিন্তু তিনি বিপ্লবের শত্রুদের প্রচারে প্রভাবিত হন নি—বিভ্রান্ত তো নয়ই। যুদ্ধের পঞ্চম অঙ্কে রাশিয়া যখন আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরল, যখন উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার, কবির ভাষায় পাশ্চাত্য

Scanned with CamScanner

সভ্যতার, প্রতিবাদী আদর্শকে শিরোধার্য করল, তখন রাজনীতির ব্যাসকূট মোচনে চিন্তাকুল না হয়ে তিনি তার সততায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নিদারুণ দুর্দশায় 'Real Politik'-এর কীর্তনীয়ার দল যখন কুম্ভীরাশ্রুতে জগৎ প্লাবিত করছিল তখন রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ঐ দুর্দশা ও দুর্দান্ত সংগ্রাম প্রমাণ করে না যে, রাশিয়া বিপথগামী হয়েছে, জাহান্নামে গেছে। সে-দেশের সংগ্রাম যে এক মহৎ আদর্শের জন্য, সে-সংগ্রামে আপাত ব্যর্থতাও যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের দিকে সুনিশ্চিত অগ্রগমন—তাও বলেছেন। এসব কথা বলা সেদিন সহজ ছিল না। বাধা ছিল দুরকমের—বস্তুগত ও আত্মগত। প্রকৃত সংবাদের অভাব, মিথ্যা প্রচার ও বিদেশী শাসকের বিরূপতা একদিকে, অন্যদিকে নিজস্ব জীবনদর্শন ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার প্রবল বৈপরীত্য। তাই তাঁর যুক্তিযুক্ত ঘোষণা—বিচারের সময় এখনও আসে নি। একই সঙ্গে লক্ষণীয়, রাশিয়ার ঘটনাকে তিনি বিশ্বনাট্যের অন্তর্ভূত রূপে দেখেছেন। এই দৃষ্টিই সেদিন তাঁকে কালের কুটিল গতি সম্বন্ধে সচেতন রেখেছিল। এরই দৌলতে তিনি যুদ্ধকে দেখেছেন যুগসন্ধিক্ষণ রূপে। যে ভাবী যুগের জন্ম-সম্ভাবনা তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনো প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য নেই। তাঁর স্বপ্ন ভিন্ন এবং এই প্রবন্ধে তার বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

'The world is waiting for the birth of the child, who believes more than he knows, who is to be the crowned king of the future, who will come amply supplied with provisions for his daring adventures in the moral world, for his explorations in the region of man's inner being."

'শিশুতীর্থ' তখনও রচিত হয় নি, 'নবজাতক' সুদূর। কিন্তু এই রচনা প'ড়ে বোঝা যায় যে, মহামানবের স্বপ্ন তাঁর মনে জেগে উঠছিল অনেক আগে থেকে। 'Prosperity built upon moral nihilism'—এর বিরুদ্ধে মানুষের আত্মিক শক্তির কোনো প্রকাশ রুশ বিপ্লবে ঘটছে কিনা তা নিশ্চিত ক'রে বলবার মতো নির্ভরযোগ্য তথ্য তিনি পান নি; তা ছাড়া

সে-সময়ও তখন নয়। তবু ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে, বিপ্লবের মাত্র আট মাস পরে, তাঁর মন যেভাবে কল্পনায় লীলায়িত হয়েছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঐ বিপ্লব তাঁর মনে আশার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল তখনই। তা যদি না হয় তবে কেন এই প্রবন্ধ, কেন 'বিজয়ী' কবিতা, কেনই বা প্রবন্ধের শেষ বাক্যের উদ্দীপ্ত কল্পনা ও বিশ্বাস?

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদী ছিলেন না। এই প্রবন্ধ প্রমাণ করে যে, তিনি বিপ্লবের শত্রুও ছিলেন না। বরং শত্রুদের ঘৃণ্য কুৎসার মুখে তাঁর অবস্থান ঠিক ক'রে নিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হন নি। সেই অবস্থানে তাঁকে নিরাসক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু নিস্পৃহ, কি? তিনি মোহমুক্ত নিশ্চয়, কিন্তু বিমুখ নন কিছুতেই।

১৯১৯ সালের 'Clarte' ঘোষণাপত্রে[১১] তাঁর স্বাক্ষরের সংবাদ জেনে মনে হয়, রুশ বিপ্লবের প্রভাব অলক্ষ্যে তাঁর মনের গভীরেও হয়তো পৌঁছেছিল। তা যদি না হত, সত্যিই যদি তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতি বিমুখ হতেন, যদি ঐ মতাদর্শের অন্তত সাময়িক প্রভাবও কিছুমাত্র না পড়ত তাঁর ভাবনায়, তবে কি ঐ ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতেন? কিছু না ভেবেই, অনুরোধে বা উপরোধে প'ড়ে সই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—ভাবা যায় না। ঐ ঘোষণার প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও পঞ্চদশ সূত্রে বলা হয়েছিল—

১. "আমাদের সমাজব্যবস্থাটাই ভুল। এই ব্যবস্থার পরিণাম স্বল্পসংখ্যকের সুবিধা, স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়ন, ধ্বংস এবং হত্যা।"

৫. "আদর্শের মতোই ক্ষমতাও সবার আয়ত্তে থাকা চাই। দৈহিক বা মানসিক, যে প্রকারেই হোক, একমাত্র শ্রমই সম্মানীয়। একমাত্র শ্রমেরই পুরস্কৃত হওয়া উচিত। মুনাফাবাজী গরিষ্ঠসংখ্যকের বিরুদ্ধে অপরাধ, উত্তরাধিকার চৌর্যের সামিল।"

৬. "সকল মানুষকে হুবহু একই রকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়াতেই সাম্যের প্রকাশ। শ্রেণীসমূহের বিলোপসাধনই শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য।"

১৫. "ক্ষমতাসীনেরাই বিপ্লবের কারণ। বিপ্লবকে রক্তাক্ত ক'রে তোলে প্রতিবিপ্লবীরা। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত তাঁরা নন, পক্ষান্তরে

Scanned with CamScanner

দমনকারীরাই যেকোনো ধরনের যুদ্ধের জন্য দায়ী।"

রবীন্দ্রনাথ সই করেছিলেন ব'লেই ধ'রে নেওয়া ঠিক হবে না যে, এই ঘোষণা সমগ্রভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিংবা এর সঙ্গে তাঁর ঐকমত্য সুনিশ্চিত। মোটেও না। এই ঘোষণার সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের বিরোধ স্বতঃসিদ্ধ। এ থেকে আমরা যা বুঝি তা এই : বিশ্বাসের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না ; সভ্যতার সংকটের চিন্তায় তাড়িত হয়ে, উদ্ধারের ঐকান্তিক আগ্রহে, কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিলেছিলেন নিঃকুণ্ঠায়। ব্যাপারটা শুধু যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে ; অসম্ভব নয় এক্ষেত্রেও সেই অনুকম্পা—যার প্রকাশ দেখেছি ইংরেজী প্রবন্ধটিতে।

৩.

অনুকম্পা আর সমর্থন সমার্থক নয়। অনুকম্পা ভিন্ন সমর্থন সম্ভব না হলেও সমর্থনশূন্য অনুকম্পা অসম্ভব নয়। রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ যতটুকু ভেবেছেন—তা পরিমাণে যত সামান্যই হোক—তাতে অনুকম্পা ও উৎসাহ প্রকাশ পেলেও সমর্থন প্রকাশ পায় নি। ধনতন্ত্র ও জাতিপ্রেম যখন মানুষকে সত্যভ্রষ্ট অর্থাৎ মনুষ্যত্ব থেকে ভ্রষ্ট করেছে তখন রাশিয়ার মানুষ সত্যলাভের জন্য দুঃসাহসিক ও দুঃখময় সাধনাকে শ্রেয় ব'লে বরণ করেছে, পূর্বোক্ত দুঃশক্তির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়েছে—এই জন্য কবির অনুকম্পা, এই জন্য তাঁর আশা। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব দমনে সোভিয়েত সরকারের বিধি-ব্যবস্থায় তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে নানা উপলক্ষে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সমবায় ২' প্রবন্ধে যেমন—

"ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি করে, রক্তপাত করে, ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে

Scanned with CamScanner

আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেই জন্যেই গায়ের জোরের উপর আস্থা বেশি; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত পাই।"[১২] কল্যাণসাধনেও জবরদস্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমর্থন-যোগ্য নয়। কেননা তাতে 'অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়'। এই আপত্তি এক প্রাচীন বিতর্কের দিকে ঠেলে দেয়। উপায় ও উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ নিয়ে সেই বিতর্ক। এ প্রসঙ্গে বিশ্বের বিবেকী মানুষদের মতবিরোধ প্রাচীন ও প্রবল। এই বিতর্ক ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপিত হয়েছিল 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। বৈপ্লবিক সন্ত্রাস ও গণবিপ্লব এক না হলেও উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি অভিন্ন নৈতিক কারণে। কিন্তু যা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, তা হল—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে রেখাচিত্র তিনি এখানে এঁকে-ছেন তাতে বিপ্লবের শত্রুদের মতো শুধুমাত্র কালো রঙই ব্যবহার করে-ছেন। বিপ্লবকে যদি দস্যুবৃত্তি বলা হয়, তবে বলতেই হয়, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত এবং বিরোধী।

"...if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade like the morning star, only to usher in the sunrise of the New Age."

বিপ্লবোত্তর রাশিয়া সম্বন্ধে এই আশা ও ঐ দস্যুবৃত্তির অভিযোগ একই কণ্ঠে উচ্চারিত হতে দেখে অবাক লাগে। অবশ্য আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই দুই বিপরীতেরই মূলে আছে তাঁর উদারনৈতিক মানবতাবাদ, এবং তিনি এক সংবেদনশীল কবি ও ভাবুক—রাজনীতি তাঁর না বৃত্তি না ব্রত।

তবু অন্য এক প্রশ্ন জাগে। এই অভিযোগ কি শুধুই ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত? এর মধ্যে কি উষ্মা, হয়তো-বা বিদ্বেষ, কিছুমাত্র নেই? থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তীকালেও এই রুষ্ট কণ্ঠ শোনা যাবে একাধিক

Scanned with CamScanner

উপলক্ষে। রুশ বিপ্লবের আট মাস পরে যে-কথা বলেছিলেন, যে-আশায় দীপিত হয়েছিল তাঁর কল্পনা, পরবর্তী বছরগুলিতে তার থেকে ভিন্ন, এমন কি প্রতিবাদী বক্তব্য যখন পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর মত বদলেছিল। হতেই পারে। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আদৌ সুলভ ছিল না; অথচ যা ছিল পর্যাপ্ত ও পরিকল্পিত—তা হল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবিমিশ্র কুৎসা, দুরভিসন্ধিপূর্ণ সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার। প্রথম দিকে সেই প্রচারে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হন নি। কিন্তু কে না জানেন, অবিরাম প্রচারের ফলে মিথ্যাকেও সত্য ব'লে ভ্রম হয়। কালক্রমে ঐ বিরুদ্ধ প্রচার তাঁর ধারণাকেও বিচলিত করতে পারে। এই সন্দেহ জোর পায় তখনই যখন দেখি সমাজতন্ত্রের শত্রুদের আচার-আচরণ তাঁর সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল না। ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে তিনি এণ্ডরুজকে লিখেছিলেন, "রাশিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চলছে।"[১৩] ১৯২৫ সালের একটি রচনাতে লিখেছেন, "আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখতে পাই, বল্‌শেভিক মতকে স্বদেশের মন থেকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে নানাপ্রকার বল প্রয়োগ করা হচ্ছে।"[১৪] এমন সচেতন ছিলেন যিনি তিনিই এর কয়েক মাস পরে ১৯২৬ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্ক নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নিচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নিচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No...............

থাকটা নিচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জারতন্ত্র ও বল্‌শেভিকতন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।”[১৫]

আশ্চর্য! আর অনুমান নয়—এবার নিশ্চিত না হয়ে উপায় নেই যে, কবি মত বদলেছিলেন। মতের বদল শুধু নয়, আরো এক গূঢ় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় কথায় কথায় নিশ্বসিত তাঁর উত্তেজনা ও ঘৃণা, ক্রোধ ও আক্রমণ—এক অপ্রত্যাশিত অগ্ন্যুদ্গার যেন। অথচ বল্‌শেভিজ্‌ম তাঁর আলোচ্য ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর পুস্তিকা এবং তার উপলক্ষ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার—এই যেখানে প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত, সেখানে প্রস্তাবনায় এরকম যুক্তিবিরহিত বক্তব্য ও কটুকাটব্য আকস্মিক লাগে, অপ্রাসঙ্গিক তো বটেই—যেন ইচ্ছাকৃতও। তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান পুরুষ যখন বলেন ‘রাশিয়ার জারতন্ত্র ও বল্‌শেভিকতন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া’ কিংবা সেখানে ‘গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া’ জমেছে তখন দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয়—সত্য থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন। এই বিচ্যুতি কেন, কেন এই বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণ—স্বাভাবিকভাবেই জানতে ইচ্ছে করে। জানাটা প্রয়োজনও, কেননা এই বিচ্যুতি স্থায়ী হয় নি। একদিন তিনি সত্যকে লাভ করেছিলেন এবং তখন তাঁর মত আবার বদলেছিল।

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার “পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।”[১৬]

এ তাঁর মন-ভোলানো কথা নয়, শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিপুণ ছলাকলা এ নয়; এ যে তাঁর মনের কথা, তার প্রমাণ আছে তাঁর বিচিত্র কর্মধারায়। ১৯১১ সালে উইলের যে খসড়া তিনি প্রস্তুত করেছিলেন তাতেও জমিদারী বিষয়ে তাঁর উদ্ধৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল এবং তদনুযায়ী রথীন্দ্রনাথকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৭] ‘রায়তের কথা’য় প্রমথ চৌধুরী যা বলেছেন তিনি তার বিচার করেছেন দেশ-কাল-পাত্রের বাস্তব পট-

Scanned with CamScanner

ভূমিতে। উপরন্তু আপন অভিজ্ঞতার আলোতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্যার সমাধান তাতে হবে না, বরং সমস্যা ভিন্নভাবে জটিল হয়ে উঠবে মাত্র। তাঁর যুক্তির অনুপুঙ্খ রোমন্থন এখানে অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু মনে রাখা দরকার তাঁর বক্তব্য—কেননা, শ্রেণীস্বার্থের চিন্তায় কারো কারো উৎসাহিত হওয়া অসম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন—

"আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময় সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?"

এই ভাবনা থেকে আরো বলেছিলেন—

"আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়।...পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতি-নিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।"

আত্মশক্তি যে জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্য থেকেই কেবলমাত্র জেগে উঠতে পারে, কোনো খাপছাড়া প্রণালীতে যে তার বিকাশ ঘটতে পারে না—এই প্রত্যয় তো কমিউনিস্টদেরও। তবু তিনি বলেছেন—

"আমি নিজে জমিদার, এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আর যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না।"[১৭]

সন্দেহ নেই, তাঁর দৃষ্টি নিদারুণভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

Scanned with CamScanner

তা যদি না হত তবে রায়তদের স্বার্থবোধ ও জমিদারের স্বার্থবোধ একই বিষয়বুদ্ধি ব'লে গণ্য হত না। হয়তো সমস্তই তর্কের খাতিরে, তবু তার কিছু দাগ থেকেই যায়, এবং আজকের পাঠকের পক্ষে তা হয়ে ওঠে দুঃখজনক। ছন্দোময় সত্তার এই আগ্নেয় উৎসার, মানবপ্রেমী কবির এই বিষয়বুদ্ধির দোহাই, আমাদের শুধু মর্মাহত করে না, সেই সঙ্গে কৌতূহলী ক'রে তোলে। অন্য কোনো কারণ বোধ হয় ছিল যাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং কমিউনিস্টদের সাধনতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতিকে আক্রমণ না ক'রে পারেন নি।

প্রসঙ্গত মনে প'ড়ে যায় তাঁর চীন-ভ্রমণের এক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। ১৯২৪-এ তিনি যখন চীনে গিয়েছিলেন তখন সেদেশের কমিউনিস্ট যুব-সম্প্রদায় তাঁর চিন্তাধারা ও বক্তব্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল। রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচার শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ চীনে পৌঁছবার কয়েক মাস আগে থেকেই। কমিউনিস্ট যুবকেরা তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছিল। বিরোধিতা থেকে অসহযোগ ও প্রত্যাখ্যান এমন পর্যায়ে যায় যে, অতিথির প্রতি সদাচারও স্বীকৃত হয় না, বাতিল করতে হয় পূর্বঘোষিত কয়েকটি সভা। 'ফিরে যাও, পরাভূত দেশের ক্রীতদাস'।—হ্যাংকাওতে এই চীৎকৃত প্রত্যাখ্যানে লাঞ্ছিত হন কবি।[২০] সেই তুমুল বিরোধিতা ও অসম্মান কি সংবেদনশীল কবির পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব? এ হয়তো জল্পনা, তবু তাঁর মতান্তর যেহেতু মনান্তরের ইংগিত দেয়, সেহেতু প্রশ্নটা উত্থিত হয়ে থাকে। প্রবন্ধে অবশ্য এক সমসাময়িক উপলক্ষের কথা আছে।—

"...ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব-আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন।...য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি 'রায়তের ভালো করব', তখন

য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ব-বঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে 'পিষে ফেলো, দলে ফেলো'। অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে।"[২১]

সুতরাং রুশ বিপ্লবের বাণী এদেশেও, এমনকি সুদূর পূর্ববঙ্গেও গ্রামে-গঞ্জে তখন প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে,—আলোড়ন তুলেছে এক দল যুবকের চেতনায়— আর সেই সব উদ্দীপিত ও আলোড়িত চিত্তের আস্ফালনে, বাগাড়ম্বরে, বিপ্লব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতটা গিয়েছে বদলে এবং বদলে গিয়েছে কবির মত। দূর থেকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দর্শন ও নিরবধি কালের উপর তার বিচারের ভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা আর সম্ভব হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা কোনো শাস্ত্র মেনে গ'ড়ে ওঠে নি। তাঁর সৃজনশীল ও সংবেদনশীল মন উদ্ভাবন করেছে নিজস্ব পথ—তার কতটা কল্পনা, কতটা রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানে বাস্তবিক, তা নিয়ে চুলচেরা বিচার করবার জায়গা এটা নয়। আমাদের পক্ষে যা জরুরী তা হল তাঁর এই মৌলিকতা এবং সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার তাঁর চিন্তার দুটি বৈশিষ্ট্য। এক—তাঁর রাজনীতিতে প্রতিবাদ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাত নেই; তা গঠনমূলক, বিরোধমূলক নয়। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠবার সাধনাই তাঁর রাজনৈতিক সাধনা, তাতে গণসমবায় আছে কিন্তু গণসংগ্রাম নেই। দুই—বিরল বিচ্যুতি ('মন্ত্রি অভিষেক') সত্ত্বেও কংগ্রেসের রাজনীতিতে তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল না; আস্থা ছিল না সে যুগের বিপ্লবীদের চিন্তায় এবং চর্যায়ও। অর্থাৎ সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও কর্মের কোনো সাযুজ্য ছিল না। বরং এক নিদারুণ অনন্বয়ে আলোচ্য সময়ে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমনই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল সেই ক্লান্তি ও

বিচ্ছিন্নতা যে, বিদেশে পলায়নের উদগ্র ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রম্যাঁ রলাঁকে একটি চিঠিতে সেই মানসিক অবস্থা বর্ণনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"...এক নৈতিক নিঃসঙ্গতা, যা অদৃশ্য এবং নিরন্তর বোঝা—তাই আমাকে বেশি পীড়িত করছে। যদি মহাত্মা গান্ধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং এইভাবে সাধারণের অনুমোদনের প্রবাহে নিজেকে একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু আমি আর সত্য গোপন করে চলতে পারি না যে, আমাদের সত্যের ধারণায় এবং আমাদের সত্যের অনুসরণে আমরা আমূল পৃথক। আজকে ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত না হয়ে থাকাটা এবং তবুও চারপাশে শান্তি খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব। আর এই জন্যই এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা নিয়ে আগামী মার্চে আমি পলায়নের অপেক্ষায় আছি।"[২২]

মনে রাখতে হবে, মহাত্মাজীর রাজনীতিকে তাঁর পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব না হলেও এবং অসহযোগ ও চরকার প্রতি অনীহা ও বিরুদ্ধতা প্রকাশে তিনি অবিচলিত থাকলেও, মহাত্মার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ, অবিমিশ্র ও আবেগময়। তবু তাঁর এই মর্মদাহ! এই মর্মদাহ সেখানেই যেখানে আত্মীয়তা সব থেকে সহজ ছিল। অহিংসা ও মানবপ্রেম উভয়েরই অত্যাজ্য আদর্শ। তবু বেদনায় ভরে গিয়েছে কবির হৃদয়। এ-অবস্থায় বল্‌শেভিক আদর্শের প্রতি এবং তার ভারতীয় অনুগামীদের প্রতি তাঁর চিত্তবিক্ষোভ অস্বাভাবিক নয়।

ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন এই প্রবন্ধেই—এক সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক মূল্যায়ন সহ। কেন সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার প্রতি তথা সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহসা আক্রমণ তা বুঝতে গেলে সেই মূল্যায়নে একবার ফিরে যাওয়া দরকার। সেখানে তাঁর বক্তব্য এই—

"আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কি শব্দসম্বলে, কি অর্থসম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে; আর যাদের অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করবার জন্যে উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।"[২৩]

এই হল তাঁর চোখে কংগ্রেসের রাজনীতি। অন্য মতের যাঁরা, যাঁদের নিয়ে এই আলোচনা, তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—

"…এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত-পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।"[২৪]

এ থেকে কতকটা আঁচ করা যায় কোথায় তাঁর অসন্তোষের মূল, কোন্ বেদনায় এমন ক্ষুব্ধ ও কটুভাষী হয়ে উঠেছেন স্থিতধী চারুবাক কবি, কেনই-বা বল্‌শেভিকদের উপর, ভারতে তাদের অনুগামীদের উপর, তাঁর এবংবিধ অকুণ্ঠিত আক্রমণ।

ভারতের রাজনীতি 'Made in Europe' কোনো মতাদর্শের দ্বারা চালিত হবে—এমন চিন্তাকে তাঁর মনে হয়েছে অশ্রদ্ধেয়। এই অশ্রদ্ধার দুটি ভিত্তি চোখে পড়ে—একটি তাঁর বেদনা, অন্যটি বিশ্বাস। এ দেশের রাজনীতির যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তারই জন্য বেদনা। দেশের মানবসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের আত্মরতিময় রাজনীতি তাঁর মর্মপীড়ার কারণ। তাঁর আক্ষেপ—

"এক দিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স নিয়ে পার্লামেণ্টীয় রাজনীতির পুতুল-খেলা খেলতে বসেছিলাম। …এখন সে নাট্যের

পালা বদল হয়েছে।"[২৫] অর্থাৎ, আমাদের রাজনীতির পরানুকরণপ্রবণতা তাঁর অশ্রদ্ধার কারণ। এদেশে যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সংক্রমণ দেখেছেন তখন তিনি দেখেছেন আগের মতোই 'নকলনৈপুণ্য', দেখেছেন গুরুবদল—ইংরেজের বদলে রুশ। এই জন্যই কি কবির মতপরিবর্তন ও সমালোচনা? হয়তো একারণেই 'বিশ্বনাট্যে'র পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, রুশ বিপ্লবের বিশ্ববাণী ভুলে গিয়ে, একান্ত ক'রে দেখেছেন তার বলপ্রয়োগের দিকটা।

গুরুবদলই যে কবির মতবদলের একমাত্র কারণ, তা মনে হয় না। প্রধান কারণও সম্ভবত নয়। কোনো উপলক্ষ ব্যতীত শান্তশীল কবি এত উত্তেজিত হবেন কেন, কেনই-বা নির্বিচারে নিক্ষেপ করবেন বিষদিগ্ধ বাক্যবাণ? প্রবন্ধ থেকে যা জানা যাচ্ছে তাতে দেখি, কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কিছু সাহিত্য তাঁর চোখে পড়েছিল। তাঁর মতে সেগুলির ভাষা ও বক্তব্য অত্যন্ত উগ্র। তা হলে কি সেই বাণীবদ্ধ উগ্রতাই তাঁর উত্তেজনার কারণ? বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়। দ্বিধা এই জন্য যে, এদেশে কমিউনিস্ট ক্রিয়া-কলাপ তখনও এতটা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে নি যে, সেই সময়ই তাকে প্রত্যাঘাত করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। দ্বিধা এই জন্যও যে, স্বদেশের অর্বাচীন কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, সেই সঙ্গে ঐ উপলক্ষকে ব্যবহার করেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধেও।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবি ব্যাপক জনগণের দাবি হয়ে উঠেছিল। কেবল কমিউনিস্টরা নয়—আরো অনেকেই ঐ দাবি উত্থাপন করেছিলেন, ঐ দাবির সমর্থনে বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনেক কৃষকসমাবেশ। ১৯২২ সালে কৃষকদের পক্ষে যে দাবি তুলেছিল ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি এবং যা প্রেরিত হয়েছিল কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে, ১৯২৫-২৬-এর প্রবল কৃষক আন্দোলনে তার নিঃসংশয় পরিগ্রহ ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কারের জন্য তদানীন্তন উদ্যোগ সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। ঐ আন্দোলনে ও আন্দোলনজনক সাহিত্যে

রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রসার। তাঁর নিজের জমিদারীতেও ততদিনে অশিক্ষিত চাষীদের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল লেনিন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বাণী। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে সমসাময়িক এক অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে কিছু আলো মেলে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এইরকম কত শত কথা ভাবতে ভাবতে একটি গাঁয়ের ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে নেমে পড়লাম। গাঁয়ের মোড়লেরা আমায় সমাদর করে নিয়ে গেল তাদের চণ্ডীমণ্ডপে। কোথা থেকে তারা একটা বেতের চেয়ার যোগাড় করে আমাকে বসতে দিল বারান্দায়। নিজেরা মাদুর পেতে আমাকে ঘিরে বসল। তাদের সকলের পরনে খাটো ধুতি, হাঁটুর উপরে তোলা। নারকেলের মালা দিয়ে তৈরি হুঁকো ঘন ঘন এক হাত থেকে আর-এক হাতে ফিরতে লাগল। সব দেখে শুনে মনে হল যেন মধ্যযুগে ফিরে গেছি, যেন পল্লীসমাজের কোনো শক্ত সমস্যা আলোচনা করার জন্য পঞ্চায়েত বসেছে।

পাকা দাড়িওয়ালা এক গ্রামবৃদ্ধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'বাবুমশায়, এ-সব ব্যাপারে কথা বেশি বলা মানেই বাজে কথা বলা। স্বদেশী ছোঁড়ারা দেশের উন্নতি নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয় শুধু। আসল কাজের বেলা কারো টিকিটুকু দেখবার জো নেই। হাঁ, লেনিনের মতো একজন লোক দেশে জন্মাত, দেখতেন সব ঠিক হয়ে যেত।'

রূঢ় বাস্তবের মধ্যে আচমকা যেন ফিরে এলাম। চেয়ার ছেড়ে সোজা ফিরে গেলাম বজরায়।"[২৬]

এ-অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কমিউনিস্ট বিরোধিতার বোধ হয় একটা গ্রহণ-যোগ্য পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জমিদারী স্বার্থের প্ররোচনায় তিনি যে আক্রমণশীল হয়ে ওঠেন নি, পুনরুক্তি হলেও সেকথা আবার বলা দরকার। ঝড়ের কেন্দ্র ছিল অন্যত্র। জমিদারী ব্যবস্থায় তখনও পর্যন্ত তাঁর আস্থা ছিল। জমিদার ও প্রজার মধ্যে এক ন্যায়নিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্ভব ব'লে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন; শুধু তাই নয়—উচিত ও কাম্য

বলেও মনে করতেন। সেই বিশ্বাস থেকেই ১৯০৮ সালে পাবনা সম্মেলনে তিনি বাঙলার জমিদারদের সচেতন ও উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাস থেকে এককভাবে তিনি জমিদার, জোতদার ও রায়তের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পল্লীসংগঠন ও পল্লীর পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করেছিলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। এই পথে দেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে; স্বরাজের পাদপীঠ হয়ে উঠবে গ্রামগুলি—এ ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন নিজের জমিদারীতে, তার ব্যর্থতা তাঁকে দুঃখ দিলেও নিরুৎসাহ করতে পারে নি। তাই শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা। গ্রামের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্ককে অপরিবর্তিত রেখেই রবীন্দ্রনাথ গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও আত্মনির্ভর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। 'রায়তের কথা' লেখবার অল্প দিন আগে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পূর্ববঙ্গে যান। সে-যাত্রায় ময়মনসিংহে ও কুমিল্লায় যে-সব ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর পল্লী-সংগঠনের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসই পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদদাতার যে বিবরণ ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুটি কিস্তিতে ছাপা হয় তাতে কবির বক্তব্য বেশ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। কবি বলেছিলেন—

"......কর্মক্ষেত্রে সকলে আপন আপন শক্তিকে ব্যক্ত করে তুলতে পারলে যথার্থ ঐক্য হয়। কি কর্ম ? এই যে বাঙ্গলাদেশের পল্লীগুলি নিরন্ন হয়েছে, নিরানন্দ হয়েছে, তার স্বাস্থ্য দূর হয়েছে, সেখানে কর্মদ্বারা তপস্যাদ্বারা নূতন প্রাণ দিতে ব্রতী হতে হবে।...

সে আজ ৩০ বৎসরের কথা। বাঙ্গলা দেশের যেখানে আমাদের প্রাণের নিকেতন, সেইখানে আমাদের প্রাণের যথার্থ কেন্দ্র, সেইখানেই আমরা সার্থকতা লাভ করব। তাই বলেছিলাম, এবং নিজের কাজের সূত্রপাত করেছি।...

...আমার দেশকে আপনারা জানবেন কর্মের দ্বারা, এইটি দেখে যাব—জীবনের এই অবসান কালে দেখে যাব দেশের সর্বত্র কর্মশক্তি উদ্বোধিত

হয়েছে। যদি না দেখতে পাই, তবে জানব এই ভাবাবেগে সত্য নেই। সত্যকার কাজ সভাসমিতিতে নয়। সত্যকার কাজ যেখানে দারিদ্র্য সেখানে গিয়ে, যেখানে অপমান সেখানে দাঁড়িয়ে—দেশের সকলের সঙ্গে মিলে আমাদের তার প্রতিকার করতে হবে। এর বেশী বলতে চাই না। ……সমস্ত পল্লীর প্রাণকে যারা জীবন্ত করে তার বিচিত্র অভাব দূর করতে একত্রিত হয়েছেন,—আপনাদের বলছি তাদের একলা রাখবেন না; অসহায় রাখবেন না। তাদের উপযুক্ত রূপে আনুকূল্য করবেন।”

কুমিল্লায় যাওয়ার পথে কিশোরগঞ্জ স্টেশনে জনতার অনুরোধে কবিকে গাড়ি থেকে নেমে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হয়। সংবাদদাতা জানিয়েছেন—

“তিনি বলেন যে, বহুদিন পূর্ব হইতে তিনি এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন —আমাদের স্বদেশের উদ্ধার করিতে হইলে পল্লীতে পল্লীতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিচিত্র কল্যাণ কর্মের অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে প্রীতির [দ্বারা] ঐক্যবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় কল্যাণকর্ম গড়িয়া তুলিতে পারে, এইজন্য সকলকে অনুরোধ করেন।”

কমিউনিস্ট চিন্তা ও কার্যক্রমের সঙ্গে এর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। তাঁর স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলতে হলে অপরিহার্য ছিল যে স্থিতাবস্থা, কমিউনিস্টরা ভাঙতে চাইছিলেন তাকেই। তাঁদের নিজেদের শক্তি বিশেষ ছিল না; কিন্তু কৃষক-প্রজা পার্টি যে আন্দোলন সংগঠিত করছিল তখন তা বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্টরা ঐ দলের মধ্যে থেকেই কাজ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ময়মনসিংহ ভ্রমণের মাত্র এক মাস আগে ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারী ময়মনসিংহে শ্রমিক ও রায়ত সম্মেলন হয়েছিল। কয়েক হাজার রায়ত ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলন ছাড়াও তখন রায়তদের বেশ কয়েকটি সমাবেশ হয়েছিল ময়মনসিংহের নানা স্থানে। এই রকম আলোড়িত ও আন্দোলিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহে গিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ‘রায়তের কথা’র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের

Scanned with CamScanner

একটা সম্ভাব্য কিন্তু যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। তার অভাবে 'রায়তের কথা' শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অসংলগ্নও। আমরা তো জানি, পরিশীলিত ভাষায় তীব্র সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ; এ-ও তো কারো অজানা নয় যে, তাঁর শিল্পিত সৌন্দর্যময় ভাষা তাঁর মুখোশ নয়—তাঁর স্বভাবেরই সাবলীল প্রকাশ। তাই যখন দেখি এখানে তিনি কথা বলছেন অন্য স্বরে, বিভাষায় যেন-বা, তখন তলিয়ে দেখতেই হয়। তাঁর পল্লীসংগঠন প্রকল্প ও বিশ্বাসের সঙ্গে কমিউনিস্ট কার্যক্রম ও ভাবধারার যে বিরোধ এতকাল ছিল চিন্তার স্তরে, এই সময়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল বাস্তবে। যতদিন না ঐ বিরোধ বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, স্বাধিকার-সচেতন কৃষক যতদিন না গ্রামের স্থিতাবস্থাকে 'চ্যালেঞ্জ' করেছিল, ততদিন এভাবে আক্রমণ হানবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ১৯২৬ সালে যখন পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটল তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিবর্তন প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তাঁর চেতনায়। 'রায়তের কথা' বোধহয় সেই প্রতিক্রিয়ার ফল।

এই প্রবন্ধ রচনার কয়েকদিন পর রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে যান। ১৯২৬ সালের মে মাস সেটা। প্রথমে মুসোলিনীর ইতালীতে, সেখান থেকে স্যুইজার-ল্যাণ্ডে রম্যাঁ রলাঁর কাছে, তারপর অন্য দেশে। রলাঁ তাঁকে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর শ্বাপদ স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত করান, ইতালীর নির্যাতিত সমাজতন্ত্রীদের সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। পরবর্তী ঘটনাবলীর বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ইতালীর তিক্ত ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় রাজনীতি বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিয়ে থাকবে আশা করা যায়; তবে ঐ রাজনীতির মর্মগত বিরোধ অর্থাৎ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধ তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

সন্দেহটা জেগে ওঠে তাঁকে তখনই বলকান দেশগুলিতে যেতে দেখে। অথচ য়ুরোপীয় রাজনীতির যথাযথ অবস্থাটি জেনে নেবার, বুঝে নেবার সুযোগ তাঁর হাতের কাছেই ছিল। রলাঁ তো ছিলেনই, আরো যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ

রায়। তাছাড়া, ১৯২৬-এ জুলাই মাসে কবি যখন ভিয়েনায় তখন সেখানে সমাজতন্ত্রীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল। সেই উপলক্ষে যে বিশাল সমারোহপূর্ণ মিছিল হয়েছিল, হোটেলের বারান্দায় প্রায় দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সম্মেলনের শেষ দিনে আয়োজিত অপেরায় তিনি গিয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতির পাঠিয়ে দেওয়া টিকিটে। এই সম্মেলন তাঁর মনে কোনো ঢেউ তুলেছিল কিনা—কবি কিংবা সেই ভ্রমণে তাঁর সঙ্গিনী নির্মলকুমারী মহলানবিশ জানান নি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ভিয়েনা থেকেই মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ ফর্মিকিকে লিখেছিলেন দ্বিতীয় পত্র। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যখন বার্লিনে তখন বীরেন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন তাঁর কাছে। নির্মল-কুমারী লিখেছেন—

"কবির সমস্ত বক্তৃতার তর্জমা বীরেনই করতেন। সব সময়েই প্রায় আমাদের হোটেলে—কখনো কবির ঘরে, কখনো আমাদের ঘরে বসে তাঁর দিন কাটত।"[২৭] এবং "শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও সেই সময় আমাদের হোটেলে যখন তখন যাওয়া আসা।"

এর পরও যখন দেখি কবি চলেছেন বলকান অঞ্চলে, তখন আশ্চর্য লাগে এবং পূর্বোক্ত সন্দেহ উদ্যত হয়। আসলে রাজনীতি বিষয়ে তখন তাঁর উৎসাহ ছিল না, তাঁর মনের গতি তখন ভিতর-পানে।

সমকালে লেখা কয়েকটি গানে কান পাতলে রাজনীতি থেকে সুদূর এক অন্তর্মুখীন নিঃসঙ্গ মনের স্পর্শ পাই। জার্মানীতে যাবার পথে বাল্‌টিক সাগরের উপর জাহাজে ব'সে ৮ই সেপ্টেম্বর কবি লিখেছিলেন—

"সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর,
যায় চলে ওই একলা রাতে—
তারে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে॥
সুদূর দেশের বাণী ও যে
যায় বলে, হায়, কে তা বোঝে।
কী সুর বাজায় একতারাতে।"

এর পর হাম্‌বুর্গের হোটেলে ১০ই সেপ্টেম্বর লেখেন—

"রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে ; দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথ রাতে স্বপনবেশে।"

সাত দিন পরে লিখেছেন—

"ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে,
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে।"

পরের দিন লিখেছেন—

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যাবে বারম্বার।

ঐ একই দিনের আর একটি রচনা—

"তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসী সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি।"

আর ১৯শে সেপ্টেম্বরের গান—

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।"

রম্যাঁ রলাঁ কবির এই অন্তর্গত উৎকণ্ঠা ঠিক ধরতে পারেন নি মনে হয়। তাই আক্ষেপ ক'রে তাঁর ডায়ারীতে মন্তব্য করেছেন—

"হায় রে! ইতালীয় ফ্যাসিবাদের ফাঁদ এড়াতে না এড়াতে তিনি ধরা দিয়েছেন হাঙ্গারীয় বা বল্‌কান ফ্যাসিবাদের ফাঁদে! হাঙ্গারির মধ্য দিয়ে তাঁর পথযাত্রার প্রতিধ্বনি আমরা হাঙ্গারীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি। এটা শোচনীয়। আরও একবার তিনি নিকৃষ্টতম লোকদের কুক্ষিগত হতে এবং তাদের হাতে নাম ভাঙাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।"[২৮]

রলাঁ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ূরোপে' বইতে এ-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেন নি। তবে হাঙ্গেরীর ফ্যাসিস্ট নায়ক হর্টির[২৯] সঙ্গে কবির সাক্ষাতের যে বিবরণ তিনি

দিয়েছেন তাতে কিছু ইঙ্গিত আছে। বালাটন ফ্যুরেডে বিশ্রামের পর কবিকে যখন বুডাপেস্টে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল তখন উদ্যোক্তারাই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন হর্টির কাছে। নির্মলকুমারী জানিয়েছেন—

“পথে কবিকে হাঙ্গেরীর রিজেন্ট এ্যাডমিরেল হর্টির সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। আমরা সঙ্গে ছিলাম ; কাজেই আমরা সকলেই গেলাম। পাহাড়ের চূড়ার উপরে প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। রাজাদের গদিচ্যুত করা হয়েছে ; কিন্তু হর্টি রিজেন্ট হয়ে সেই সুরম্য প্রাসাদে বেনামিতে রাজ্য চালাচ্ছেন।

হর্টি মুসোলিনী এবং হিটলারের একজন পরম সহায়। তখনও হিটলারের অভ্যুত্থান হয় নি ; মুসোলিনী একাই হিরো-গিরি করছেন। কবি শহরের অতিথি ; তাঁর নিমন্ত্রণকর্তারা যখন তাঁকে দেশের রিজেন্টের কাছে একবার নিয়ে যেতে চাইলেন, তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না। কাজেই গিয়ে দেখা করে আসতে হল।”[৩০]

বুডাপেস্টে রচিত দুটি গান এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ২৭শে অক্টোবরের গানে পাই—

“পথ এখনও শেষ হল না,
মিলিয়ে এল দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আসবে কখন আঁধার রাতি॥
এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপখানি
আলোয় আলোয় মিলনহবে
পথের মাঝে পথের সাথি।”

আর ৩০শে অক্টোবর কবি লিখেছেন—

“দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে—
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে॥...
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহো আসন পেতে—

Scanned with CamScanner

তোমার বাঁশি বাজাও আসি
আমার প্রাণের অন্তঃপুরে।”

বুডাপেস্টে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাও দিয়েছিলেন; কিন্তু তার বিষয়বস্তুর সন্ধান মেলে না। উদ্ধৃত গান দুটি এবং হাঙ্গেরীতে পৌঁছবার অব্যবহিত আগে লেখা গানগুলিকে নির্ভর করে আমাদের যা মনে হয়; যে প্রতীতি সহজেই জেগে ওঠে আমাদের মনে, তা এই: আত্মগত উৎকণ্ঠা ও নিঃসীম নিঃসঙ্গতাই কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল দেশ থেকে দেশান্তরে, এবং রাজনীতি নিয়ে তিনি কোনোভাবেই বিব্রত হতে চান নি। মুসোলিনীর প্রতারণাপূর্ণ আতিথ্যের পর সেটাই কি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না? সম্প্রতি এক হাঙ্গেরীয় গবেষক লিখেছেন—

“...Tagore gave a very intersting interview to Magyar Hirlap just after his arrival. Tagore is supposed to have said that he had once been in an unpleasant situation because he had many times spoken about the strong influence of Russian revolution upon him. There after many people held the view that he was himself a bolshevik, or a sympathiser of bolshevism. ‘I must honestly confess that I have a keen interest for the new world built up by the Soviet Republic in the place of the Czarist empire and that is why I would have liked to examine Russia closely, ’he added.”

এই বিবরণ থেকে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাই তার সঙ্গে মেলে না আমাদের অধীত ও মর্মগত রবীন্দ্রনাথ। আমরা অবশ্য পড়ি নি ‘Magyar Hirlap’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ; তবু তার উপর নির্ভরশীল গবেষকের বিবরণ ক্রমান্বয়ে আমাদের বিস্মিত, সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী ক'রে তোলে। লেখক পত্রিকার বিবরণ উদ্ধৃত না ক'রেই এমন মন্তব্য করেছেন—যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দূরান্বয়ও অসম্ভব; আর সে-মন্তব্যও ঠেস দিয়ে আছে এই অনিশ্চয়তায়—‘Tagore is supposed to have said’। নিজের উপর রুশ বিপ্লবের প্রবল প্রভাবের স্বীকারোক্তি

Scanned with CamScanner

নাকি রবীন্দ্রনাথ করেছেন বহুবার এবং তার ফলে অনেকেই নাকি তাঁকে বল্‌শেভিক বা বল্‌শেভিকবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব'লে মনে করেছেন, আর সেজন্য তাঁকে নাকি একবার অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। আশ্চর্য!

রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীতে ছিলেন ১৯২৬ সালের ২৬শে অক্টোবর থেকে ১৩ই নভেম্বর। 'রায়তের কথা' ছাপা হয়েছিল আষাঢ় ১৩৩৩-এ অর্থাৎ ১৯২৬-এর জুন-জুলাই মাসে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে বিপরীত কথা বলেছিলেন, তা-ও আবার কোনো অন্তরঙ্গ সুহৃদদের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে নয়—বিদেশে এবং বিদেশী সংবাদপত্রের বিদেশী প্রতিনিধির কাছে, ভাবা যায় কি? ভাববার কোনো সুযোগও নেই। দেশে ফেরবার পর কবি 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' (শ্রাবণ ১৩৩৪) নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটি পড়লে বোঝা যায়, তাঁর অভিমত অকস্মাৎ বদলে যায় নি। 'সাহিত্যে নবত্ব' নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে। সেটি যদিও সাহিত্য নিয়ে লেখা, তবু, তাতেও তাঁর রুশ-বিরোধী মনোভাব প্রকট।

অন্যদিকে, রাশিয়ায় যাবার ইচ্ছাও তাঁর জেগেছিল সেই য়ুরোপ-ভ্রমণের সময়েই। তাৎক্ষণিক কোনো উপলক্ষ ছিল কিনা জানা যায় না। স্টকহোমে সোভিয়েত দূতাবাসের প্রথম সচিব আ. আরোসভের কাছে কবি সে-ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কেন তিনি সেদেশে যেতে চেয়েছিলেন? বার্লিনে এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপচারিতে কবি বলেছিলেন—

"এই যাত্রায় (ইওরোপে) খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়া যাব, দেখতে চাই তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, সলোভিওভের দেশ। তারপর মরলে আফশোষ নেই। খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আর আমার বেশি দিন নেই।...এই রুগ্ন হৃদ্‌যন্ত্রটা এবার জানান দিয়েছে, আর সে বেঁচে থাকতে চায় না। তাই তাড়াতাড়ি রাশিয়া দেখে নিতে হবে।... মহান রুশ জাতি অন্তরে যে সম্পদ গড়ে তুলেছে তা বিশ্বসভ্যতার রত্ন-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেছে। গত কয়েক বছরের রক্তাপ্লুত ঘটনা সত্ত্বেও

এখন তারা মহা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে।"[৩২]

এ থেকে জানা যাচ্ছে কেন কবি রাশিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। রাশিয়া তাঁকে আকর্ষণ করেছিল দু'দিক থেকে। এক, তার মহান সাহিত্য ; দুই, তার মহান ভবিষ্যতের নির্মাণ।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে, তথা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে, রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের যে বৃত্তান্ত এ-পর্যন্ত বিবৃত হল, তাকে যদি চিহ্নিত করতে হয় এক কথায় তবে বলতেই হয় তা অস্থির ও স্ববিরোধী ; ঔৎসুক্য ও অনীহা দুইই তাঁর চেতনায় প্রবহমান ছিল। রাশিয়ায় যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর মনে কখনো প্রধান হয়ে উঠেছে বিরুদ্ধতা, কখনো কৌতূহল ও উৎসাহ ; আবার এমন সময়ও গেছে যখন ঐ দেশের প্রতি সহানুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়েছে তাঁর কল্পনা—যা দমিত হয় নি চতুষ্পার্শ্বের তুমুল চাপেও। কয়েক বছর পর তিনি যখন সোভিয়েত রাশিয়াকে চাক্ষুষ করলেন, তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৌলতে তিনি হয়ে উঠলেন সমাজতন্ত্রের গুণমুগ্ধ শুভার্থী, স্নেহশীল সমালোচনায় সতর্ক ক'রে দিলেন সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের, তাঁদের কাছে দাবি করলেন ঔদার্য—যেমন ক'রে থাকেন আপনজন।

৪

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি দেখেছিলেন, দেখে-শুনে তাঁর কি মনে হয়েছিল—সে-সব তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে। তাঁর সেই সব কথা সাজিয়ে গুছিয়ে সূত্রবদ্ধ ক'রে দেখা অর্থহীন নয় ; বরং বিষয়ের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে হলে সেটা অত্যাবশ্যক। ঐ বইয়ের বাইরে যা আছে তার পরিমাণ বেশি না হলেও মূল্য কম নয়। সে-সবও একত্র ক'রে দেখা প্রয়োজন। তবে তার আগে ইতিহাসের দিক থেকে এবং বিষয়গত বিচারের স্বার্থে কিছু তথ্য, কিছু সংবাদ সংকলন ক'রে নেবার আছে।

আরো একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যাওয়ার প্রায় বছর-তিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গিয়েছিলেন সেদেশে। অক্টোবর বিপ্লবের দশম

বার্ষিকী উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে পিতা মতিলাল ও তিনি মস্কো যান ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে। মাত্র তিন দিন তাঁরা সেখানে ছিলেন। জওহরলাল তাঁর সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন 'Soviet Russia' গ্রন্থে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ; তার আগে তার বিভিন্ন অংশ প্রবন্ধের আকারে ছাপা হয়েছিল 'The Hindu' পত্রিকায়। 'রাশিয়ার চিঠি' আবেগে প্লাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও আলোচনা যে তথ্য ও সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় নি—সেটা বেশ নিঃসংশয় হয়ে ওঠে নেহেরুর রচনাকে পাশাপাশি দেখে নিলে। তখন আশ্চর্য হতে হয় কবি ও রাজনীতিকের সহমর্মিতায়। রাজনীতি বিষয়ে কবির কথায় সহজে কেউ কান দেন না—দাম তো দূরের কথা। তাই ঐ বইয়ের সাহচর্য আমাদের কাম্য। কিন্তু মূল আলোচনায় যেহেতু তা অপ্রাসঙ্গিক, সেহেতু উল্লেখপঞ্জীতে মাঝে-মধ্যে ঐ বই থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি সংযোজিত হবে।

"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল।" —এই হল 'রাশিয়ার চিঠি'র প্রথম বাক্য। আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটিকে নিরীহ মনে হলেও সত্যিই কি তাই? নিরীহই যদি, তবে কেন 'অবশেষে'? কেনই বা লেখক 'এলাম' না লিখে লিখলেন 'আসা গেল'? মনে হয় না কি, সরল সমতল নয় এই বাক্য, এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন যেন অন্য কোনো কথা? মনে হওয়া স্বাভাবিক ; কেননা কবির রাশিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূরণের মধ্যবর্তী যে ইতিহাস তা ঘটনাবহুল না হলেও বিঘ্নময়। শুধুই শারীরিক অসুস্থতা নয়, বাধা ছিল অন্যদিক থেকেও ; —কোনো কোনো শুভানুধ্যায়ী তাঁকে নিরুৎসাহ করতে চেয়েছিলেন। মনে হয়, বইয়ের প্রথম বাক্যে তার ইংগিত আছে। এই হ্রস্ব উচ্চারণে কান পাতলে শোনা যায় না কি এক দীর্ঘশ্বাসও? এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু যা অর্থবহ? বস্তুত এই প্রথম বাক্যেই আমরা পেয়ে যাই লেখকের উৎসুক চিত্তের ইশারাও।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "বলা বাহুল্য, আমার বহু দিনের ক্ষুধিত দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেছি।"[৩৩] বহু দিন বলতে কত দিন? একদিকে তাঁর উদ্ধৃত জবানবন্দী, অন্যদিকে 'রায়তের কথা'র বিরূপতা—এই দুইয়ের

ব্যবধান চার বছর। সোভিয়েত ইউনিয়ন দর্শনের প্রথম আমন্ত্রণ তিনি পান ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে।[৩৪] কিন্তু আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি অসুস্থতার জন্য। দ্বিতীয় আমন্ত্রণ ১৯২৬-এ; সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা 'ভক্‌স'-এর পক্ষ থেকে। আমন্ত্রণপত্রের তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬। কিন্তু যেতে পারেন নি অসুস্থতাবশত। 'Letters from Russia'-র পরিশিষ্ট থেকে জানা যায়— "It was with the greatest difficulty that he was finally persuaded to give up the idea." তৃতীয় আমন্ত্রণপত্রের তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৮। কবির পৌত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ তখন রাশিয়ায়। রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক বিনিময়ের ইচ্ছা জানিয়ে কবি সৌম্যেন্দ্রনাথকে পত্র দেন। 'ভক্‌স' কবির ইচ্ছায় সম্মত হয়ে তাঁকে পত্র পাঠায় এবং পুনরায় আমন্ত্রণ জানায়। এই সূত্রে ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ কানাডা থেকে ফেরবার পথে কোরিয়া হয়ে রাশিয়ায় যাবার কথা ভাবেন। কিন্তু জাপানী ডাক্তারের নিষেধে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় ১৯৩০ সালে। কবি তখন য়ুরোপে। সোভিয়েত শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি বার্লিনে এসে কবিকে আমন্ত্রণ জানান। রুশভ্রমণে কবিকে যাঁরা বারে বারে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন আইন্‌স্টাইন। অবশ্য সেবারও তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। 'New York Herald'-এর সাংবাদিক জানিয়েছিলেন (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০)—

"Although actively abstaining from politics, Tagore revealed, while resting in Geneva, that he is heart and soul for the Indian nationalist movement. It is understood—it is because of the impetus which his presence might give to pro-Gandhi sentiment in the U.S.A. and Russia that the coteri of Englishmen who surrounded him while here, was continually against his trips for reasons of health."

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এরকম কোনো প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধির কথা বলেন নি। তাঁর বিবরণ এই—

"মস্কো থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার

মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তি সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি রাশিয়াতে আসছি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমনকি অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি— অনেকে বলেছে, ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেছে আহারাদি সমস্তই এমন মোটা-রকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো।"[৩৬]

সুতরাং সন্দেহ নেই, অনেকে যেমন তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তেমনি নানা অজুহাতে তাঁকে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টাও করেছিলেন অনেকে।

কি কি কারণে রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর এক সময়ের বিরূপতা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হচ্ছিল তার কিছু ইংগিতও পাই উপরের অংশে। সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার প্রতি যে বিরুদ্ধতা ইতিপূর্বে য়ুরোপে ছিল, ১৯৩০-এ তা যে অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, কবি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। 'এমন-কি' অনেক ইংরেজের মুখেও ওদেশের প্রশংসা তিনি শুনেছিলেন। অনেকে বলেছে, 'ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত'। এই কারণে সেই সত্তর-ছুঁই-ছুঁই বয়সে দুর্বল শরীরেও রাশিয়ায় যাবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। "—পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।" —বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল।" ১৯২৯ সালে টোকিওতে এক কোরীয় যুবকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। কি বলেছিল সেই যুবক, কবি তা স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে পরে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং এখন তা 'রাশিয়ার চিঠি' বইয়ের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

সেই যুবকের কথায় কবির চিত্তবদল হয় নি সত্য, তবে রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য প্রবল হয়ে থাকবে। কোরিয়া কি রাশিয়া, সেবার তাঁর কোথাও যাওয়া হয় নি জাপানী চিকিৎসকের প্রযত্নে। কিন্তু সেই কথোপ-কথনের অনুরণন যে স্তিমিত হয়ে যায় নি তাঁর মনে সে তিনি নিজেই জানিয়েছেন। আরো বলেছেন—

"মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন?"

এরই পাশাপাশি মনে করা যাক তাঁর অন্যান্য মন্তব্য যেগুলি জ্ঞাপন করে কেন তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। উপরের কথাগুলি যে চিঠির সেই তৃতীয় চিঠিতেই তিনি বলেছেন—

"যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে।"

"রাশিয়া গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে।"—একথা পাই ষষ্ঠ চিঠিতে।

আর অষ্টম চিঠিতে আছে এই স্বীকারোক্তি—

"রাশিয়া-যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ওখানে জনসাধারণের শিক্ষা-বিস্তারের কাজ কি রকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।"

রাশিয়ায় পৌঁছবার পরের দিন সোভিয়েট লেখকদের সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"I have come to this country to learn. I want to know how you are solving in your country the great problem, the world problem of civilization. Civilization to-day has taken man far

away from his normal humanity. It has torn individual personality away from society. Modern civilization has given birth to an extraordinarily artificial life, it has created diseases, evoke specific sufferings and given rise to many anomalies. I do not know what ought to be done to cure modern civilization of its ills. I do not know if the path you have chosen in this country for the solution of this problem is the right one. History will judge the extent to which you have been successful. I do not wish to criticize you. I am filled with enthusiasm for the way in which you have, for the first time, afforded to all, the opportunity of acquaring education. For this, I would applaud you...In your country you are not only giving the individual scientific education, you are making him a creative personality. In this way you are realizing the greatest, the highest ideal of humanity. For the first time in history you are giving the hidden wealth of the human mind a chance to express itself. I thank you for this with all my heart."[৩৭]

১৪ই সেপ্টেম্বর পাইওনিয়র কমিউনে কবি বলেছিলেন—

"..believe me, I have come here, not so much to see what you have done and are doing now, which is great, but to visualize the future which you are creating with such fervour for the welfare of the whole of humanity."[৩৮]

রাশিয়ায় গিয়ে তিনি কি দেখলেন, কি তাঁর মনে হল দেখে-শুনে, এই সব নিয়ে আমরা আপাতত ভাবছি না; আমরা ভাবছি—বলা ভালো বুঝতে চাইছি, ওদেশে পা দেবার আগে পর্যন্ত তাঁর ঔৎসুক্য উদ্ভিন্ন হচ্ছিল কোন্ উৎকণ্ঠায় অথবা আকাঙ্ক্ষায়। প্রাসঙ্গিক সব ক'টি উক্তি ও মন্তব্য সংকলিত করবার পর স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর ঔৎসুক্যের দ্বিপত্রী উদ্ভেদ। একটা চিঠিতে কবি বলেছেন বটে 'একটিমাত্র' উদ্দেশ্যের কথা, এবং আরো দুটি চিঠিতে যদিও তার পুনরুক্তি করেছেন, তবু তাঁর জন্য স্বীকারোক্তিগুলিও কি ধর্তব্য

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.....................

নয়? রাশিয়ায় অশিক্ষার নিরাকরণ এবং শিক্ষার বিকিরণ দেখার তীব্র আগ্রহের পাশাপাশি অন্য আগ্রহও তো প্রকাশ পেয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। 'নির্ধনের শক্তিসাধনা'—যাকে তিনি বলেছেন 'সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ'—সেই সমাজতন্ত্রও তাঁকে প্রবলভাবে টেনেছিল, তার নির্মাণ চাক্ষুষ করবার জন্যও তিনি সেদেশে গিয়েছিলেন। প্রথমটিকেই কি শুধু মানবো এবং উপেক্ষা করবো দ্বিতীয়টিকে? দুটিকেই সমান গুরুত্বে না মানার কোনো যুক্তি নেই, বস্তুত না মানাটা আংশিকতা। 'রাশিয়ার চিঠি'তে শিক্ষার কথা সর্বাধিক—সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃজ্যমান সমাজতন্ত্রের কথাও কম নেই।

১৯২৬ সালে 'ভক্‌স' যে আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছিল তাতে এই কথাগুলিও ছিল—

"নতুন রাশিয়া মনে করে এখন পর্যন্ত সেই একমাত্র দেশ যেখানে সাহসের সঙ্গে এমন এক নতুন সমাজ গড়ার আয়োজন চলেছে, যে সমাজে সবাই সুখে থাকতে পারে, কেউই দুস্থ নয়। আমাদের আদর্শ অর্জন এখনো অনেক দূরের কথা কিন্তু তবু এই পথে প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। এর মধ্যেই কিছু ফল আমরা পেয়েছি, অবিশ্বাস্য কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে আমরা যে শুধু নতুন অর্থনীতি ও নতুন রাজনীতিই গড়ে তুলেছি তাই নয়, সেই সঙ্গে গড়ে তুলছি নতুন সংস্কৃতি, নতুন সাহিত্য।

আমাদের আশা এই গঠনকার্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণে আপনি আগ্রহ বোধ করবেন।

আমাদের আশা, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে নতুন জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আশা, তার প্রবল উৎস স্বচক্ষে দেখে যেতে আপনি ইচ্ছুক।"[৩৯]

বার্লিনে জনৈক সাংবাদিককে সেই ১৯২৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা আর একবার স্মরণ করি—"গত কয়েক বছরের রক্তাপ্লুত ঘটনা সত্ত্বেও এখন তারা মহা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে।" ঐ মহান ভবিষ্যতের প্রতি কোনো অন্তঃশীল আগ্রহ যদি তাঁর না থাকত, তবে,

Scanned with CamScanner

দু-বছর আগে যাকে বলেছিলেন 'গুণ্ডাতন্ত্র' সেই সোভিয়েত দেশের সঙ্গে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিনিময়ের প্রস্তাব দিতেন কি? রাশিয়ায় যাবার পথে পোল্যাণ্ডের 'বার্‌স' (ওয়ারশ?) থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

বার্‌স
পোলাণ্ড
১০ই সেপ্টেম্বর
১৯৩০

মস্কৌয়ের পথে চলেচি। আমার মনে হয় মানুষের ভাবী ইতিহাসেরও রথ চলেছে ঐ পথে। কেন চলেছে সেই কথাটা লিখে রাখি।

এই যুগের মস্ত বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে, বিশ্বইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্সাল চল্‌ছিল, টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারদিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়—কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানব সংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ সে চেহারা দেখা যাচ্চে না। তখন দেখেছিলুম একটি একটি করে গাছ, আজ দেখতে পাচ্ছি অরণ্য। আজ মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো চিন্তা ও কর্মের ভূমিকা পৃথিবী জুড়ে। জীবনসমস্যাকে দেশে দেশে বিভক্ত করে রাখবার জো আর নেই।

একদিন মানুষের ইতিহাস ধর্মের দিক দিয়ে প্রথম আপন গণ্ডী পেরিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম সমস্ত মানুষের কল্যাণকে এক করে দিয়েছিল। তার সাধনক্ষেত্র ছিল সকল জাতির মধ্যে। এই ধর্মের দূতেরা দেশ ও বিদেশ, স্বজাতীয়ের ও বিজাতীয়ের ভেদ স্বীকার করে নি এবং যারা তাদের সম্প্রদায়ের বাইরে তাদের ঘৃণা বা হিংসা করে নি।

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায় এল সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে, গায়ের জোরের প্রসঙ্গে। এল পারসিক, এল রোমক। তারা এক প্রতাপের ছত্রচ্ছায়ায় নানা দেশকে টানতে চেয়েছিল—যেমন এক পশুশালায় নানা অরণ্যের জন্তুকে এক বিধানের মধ্যে জড়ো করে সেই রকমের।"[৪০] এই সম্বোধনহীন লিপিখানি আর অগ্রসর হতে পারে নি হয়তো পথের টানেই। পরে

এর কিছু কথা ফিরে এসেছিল কবির মনে যখন তিনি লিখেছিলেন ২৫শে সেপ্টেম্বরের চিঠিটি। কিন্তু তাতে ফিরে আসে নি প্রথম অনুচ্ছেদটি যার গুরুত্ব আমাদের বিবেচনায় অসাধারণ। কারণ এখানেই কেবলমাত্র মেলে 'তীর্থদর্শন'-এর অব্যবহিত পূর্বে কি ছিল কবির স্বগত ভাবনা। রাশিয়ায় ব'সে বিস্ময়ে প্লাবিত হতে হতে যেহেতু এটি লেখা হয় নি, যেহেতু কোনো সাংবাদিকের কাছে মন্তব্য নয় এটি, এবং যেহেতু এ এক ব্যক্তিগত পত্র—সেহেতু একে মনে হয় এক অপ্রতিম ঐতিহাসিক দলিল। 'মানুষের ভাবী ইতিহাসেরও রথ চলেছে' রাশিয়ার পথে। এই কারণেই, মানুষের উজ্জ্বল উদ্ধার ও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সাধনাকে চাক্ষুষ করতে তিনি সেদেশে গিয়েছিলেন। কেন তাঁর ঐরকম মনে হয়েছিল তা যদি রাশিয়ায় যাবার আগে সম্পূর্ণ লিখে উঠতে পারতেন তবে অনেকের অনেক সন্দেহ ও অবিশ্বাসই উদ্গত হত না। তবু এই অসম্পূর্ণ জবানবন্দীও মূল্যবান দুটি কারণে। প্রথমতঃ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর চিত্তবদল ঘটেছিল সেদেশে সম্বর্ধিত হবার আগেই। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র যে মানব-ইতিহাসের ভবিতব্য—এই উপলব্ধিও ঘটেছিল 'তীর্থদর্শন'-এর আগে। এই উপলব্ধি তাঁর চিত্তে স্থায়ী হয়েছিল কিনা—এ-প্রশ্ন অবশ্য গুরুত্বময়; তবে তার মীমাংসা এখনই সম্ভব নয়, তার আগে তন্নিষ্ঠভাবে ও ঐতিহাসিক অনুক্রমে দেখে নেওয়া প্রয়োজন এতদ্বিষয়ক যাবতীয় রবীন্দ্ররচনা, মন্তব্য, প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও বিবরণী।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে পৌছন ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরিয়াম্ উইলিয়াম্‌স্, অমিয় চক্রবর্তী, ডাঃ হ্যারি টিম্বাস এবং আইন্‌স্টাইন-দুহিতা মার্গারিটা আইন্‌স্টাইন। চৌদ্দ দিন পর ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রে তিনি মস্কো থেকে বিদায় নেন।

সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে কেমন বিস্মিত, মুগ্ধ, আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল সেকথা তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখে গেছেন। কেন লিখেছেন—তাও লিখেছেন সবিস্তারে। মনে পড়ে, ইংরেজ সরকার যখন ভারত-বাসীকে কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখাতে ক্রমাগত নানা ফন্দি আঁটছিল

Scanned with CamScanner

তখন রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন রাশিয়ায় ; তার তখনই তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রাণ খুলে তিনি জানিয়েছিলেন স্বদেশের মানুষকে। কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রশংসায় তাঁর মন কেমন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ তাঁর ভাষা। সমালোচনাও করেছেন—তবে সে-সমালোচনায় আক্রমণ নেই, আছে অনুযোগ, সন্দেহ, অনুরোধ ; এবং সব মিলিয়ে কমিউনিস্ট শাসনের যে ছবিটা ফুটে উঠেছে তাঁর লোকোত্তর লেখনীতে তাকে জুজুর মতো তো মনে হয়ই না বরং তা যেন দিব্য।

কি দেখলেন তিনি সেখানে—সে-প্রসঙ্গে যাবার আগে জেনে নেওয়া দরকার কী ছিল তাঁর মনে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি যখন আরতি করছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের তখন সে-দৃষ্টির অন্তরালে ছিল কোন্ প্রেরণা ও প্রত্যাশা, কোন্ চিন্তায় তখন ছেয়ে ছিল তাঁর মন—এ না জানলে, মনে না রাখলে, তাঁর বক্তব্য বিচ্যুত হবে অত্যাজ্য পটভূমি থেকে। আইন অমান্য আন্দোলন, শোলাপুরে সামরিক শাসন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—স্বদেশের এই অস্থির ও বহ্নিমান রাজনৈতিক অবস্থা পিছনে রেখে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন রাশিয়ায়। আর—"সেখানকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পিছনে দুলছে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা।"[৪১] —এ তিনি নিজেই জানিয়েছেন। ঐ পটভূমিকা ছিল ব'লে রাশিয়ার কঠিন সাধনা, তার দুঃখ ও সাফল্য, তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যেমন উপলব্ধি করেছিলেন জওহরলাল। একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন—

"রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি, যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে। আমাদের দুঃখী-দেশে-লালিত অতিদুর্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।"[৪২]

কি তিনি দেখলেন সেকথা আত্মীয়-বন্ধুদের চিঠি লিখে জানাতে শুরু করেছিলেন ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে অর্থাৎ রাশিয়ায় পৌঁছবার এক সপ্তাহ পর থেকে। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই বলছিলেন 'ভক্স'-এর সভাপতি

অধ্যাপক পেত্রভের সঙ্গে আলোচনায় এবং বিভিন্ন সভায় ও সম্মিলনীতে। পেত্রভের সঙ্গে প্রথম আলোচনাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"By offering education to vast multitudes of your people who were kept imprisoned in the darkness of ignorance, millions of human beings who never got any chance to realize their humanity and were obliged to yield to exploitation and oppression in order to preserve their precarious existences, you have made an invaluable contribution to human progress. You are creating a new world of humanity, and for the first time in history, acknowledging the dignity of man in your scheme of practical work."[৪৩]

যখন দেখি এই কথা বলেছিলেন ১২ই সেপ্টেম্বর, মস্কোয় পৌঁছবার পরের দিন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এর আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগে ; কেননা তখনও তাঁর পরিদর্শন শুরু হয় নি। তা হলে এ কি নিতান্তই লৌকিকতা, না আগে থেকেই তাঁর মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল ? এক আমেরিকান মহিলার বইতে রাশিয়ায় শিক্ষাবিস্তারের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা তিনি পড়েছিলেন রাশিয়ায় উপস্থিত হবার আগে। তা ছাড়া য়ুরোপে নানা বন্ধুর কাছে রাশিয়ার প্রশংসা যে তিনি শুনেছিলেন সে-স্বীকারোক্তিও আমরা দেখেছি। খুব সম্ভব ঐভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা তাঁর মনে জন্মেছিল এবং তার উপর দাঁড়িয়েই পেত্রভকে তিনি একথা বলেছিলেন। চিত্ত যখন এমনি অনুকূল ও উৎসুক হয়ে উঠেছিল তখন তিনি গিয়েছিলেন রাশিয়ায়। যা-কিছু দেখেছিলেন তা সমস্তই সরকারী ব্যবস্থায় এবং একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন তাঁর পরিদর্শন সীমাবদ্ধ ছিল রাজধানী মস্কোতে। তবু যে তাঁর সমীক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্রান্ত ও উন্মোচক, তাঁর বিশ্লেষণ ও বিচার উদ্দীপক, সে বোধ হয় তাঁর অনন্য দৃষ্টির দৌলতে।

ঐ দৃষ্টির চমৎকার প্রকাশ আছে রাশিয়া থেকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিতেই। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও ঐ দৃষ্টি কবির দৃষ্টি নয় ; ঐ দৃষ্টি এক দরদী সন্ধানীর দৃষ্টি, এক নিরভিমান সমাজকর্মীর তদ্গত দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টি মুগ্ধ-

Scanned with CamScanner

কিন্তু অন্ধ নয়। মনে পড়ে, পেত্রভের সঙ্গে প্রথম আলাপে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"You have of course, as I am sure you will freely admit, made grievous mistakes at the time of your first accession to power..."[৪৪]

মর্মস্পর্শী অথচ বিচারক্ষম এই দৃষ্টির কল্যাণে মাত্র পনের দিনের দেখায় তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন নির্মীয়মাণ সমাজতন্ত্রের সত্য ও শক্তি, প্রয়াস ও প্রকর্ষ, সাম্প্রতিকতা ও সম্ভাবনা ; এবং তা সম্ভব হয়েছিল তাত্ত্বিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক আশ্রয় ছাড়াই। দু-একটি চিঠিতে সংখ্যাতত্ত্ব যে আছে সে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য নয়, নিজস্ব সিদ্ধান্তকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জানতেন না, বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কোনো পূর্বার্জিত জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল না, বরং একদা বল্‌শেভিকদের সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর মনে। সেই তিনিই যখন রাশিয়ায় গেলেন, নিজের চোখে যৎকিঞ্চিৎ দেখলেন সেই বিশাল দেশের —তখন শুধু বিস্মিত ও আনন্দিতই হলেন না, সেই বিস্ময় ও আনন্দকে পৌঁছে দিতে চাইলেন তাঁর দেশবাসীর কাছে। তখন যে সচেতনতায়, সতর্কতায় ও সমবেদনায় তাঁর আত্মোপলব্ধির বর্ণনা করলেন তাতে তাঁর বিষয়গত নিষ্ঠা কোথাও টলে যায় নি, প্রবল উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ভেসে যায় নি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত। সেই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্মলকুমারীকে লিখেছেন—

"মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের আবর্জনায় দুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল

ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য, বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনো-মতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলেছে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

মনে আছে, এরাই 'লীগ অফ নেশন্‌স'-এ অস্ত্র বর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা, নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা। এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অফ নেশন্‌স'-এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এই জন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল—কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ সামান্য নয়—য়ুরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজা-মণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি-মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।"[৪৫]

নন্দলাল বসুকে যে-চিঠি লিখেছিলেন তার প্রারম্ভেই আছে পরিপ্রেক্ষিতের

কথা। আছে 'উপসংহার' অংশেও যেখানে সমালোচনা চিঠিগুলির থেকে তীব্র। সব মিলিয়ে বোঝা যায়, কী আন্তরিক প্রযত্নে ও উৎসাহে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থাটি রবীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছিলেন। আর, অন্যেরা যাতে বোঝে সে চেষ্টায় যেন অনুপ্রাণিত হয়ে লেখনীকে চালিয়েছিলেন আপন অভিরুচি ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে।

"এরকম তথ্যসংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি।"—জানিয়েছিলেন নন্দলালকে। এই বোধ কি কোনোই ইংগিত দেয় না? রাশিয়া যদি এক অন্তর্বাহী শক্তি না হয়ে উঠত তাঁর চেতনায়, তবে এই বোধে তিনি তাড়িত হতেন কি? যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন কিভাবে গ'ড়ে উঠছে রাশিয়া—অন্য কোনো বিষয় তাঁর আলোচনায় উঠে আসে নি।[৪৬] 'রাশিয়ার চিঠি' না চিঠি, না ভ্রমণ কাহিনী। এতে কাহিনী আছে, কিন্তু ভ্রমণ নেই, আর সে-কাহিনীও বহুবাজারে কাটতি যাদের সেরকম রম্যরচনা নয়। এ এক আশ্চর্য কাহিনী, এক অভিনব মানব-বিশ্বের অন্তরঙ্গ উন্মোচন। যে সমাজতন্ত্র গ'ড়ে উঠছিল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ প্রতিহত ক'রে, যার অনেক কিছুই তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীত, তার নির্মাণের ও সৃষ্টির কাহিনী বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, শুধুই কি বলেছেন? সে-কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে কি সঞ্চার ক'রে দিতে চান নি সেদেশের সাফল্য এবং সেই সাফল্যের মূলগত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা—এমনকি, আগ্রহ? তাই যদি না হবে তবে কেন চিঠির পর চিঠিতে তিনি জ্ঞাপন করলেন সেদেশের সর্বতোমুখী বিকাশের অমৃতসমান কাহিনী, আর পদে পদে স্মরণ করলেন ও করালেন দুর্গত ভারতবর্ষকে?[৪৭] কেনই বা তাঁকে লিখতে হল এই কথা?—

"প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল—এত কাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্বল মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি

সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আমার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি।··· বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে সে বিপদ আছে, সেইজন্যেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই; কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই টেনে নিতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থদেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন।···আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।”[৪৮] বোঝা যায় কী প্রচণ্ড মানসিক আত-তিতে ভরে উঠেছিল তাঁর দিনগুলি। মনে পড়ে, রাশিয়ায় আসবার মাস তিনেক আগে কবি দিয়ে এসেছিলেন ‘হিবার্ট লেক্‌চার’ ‘The Religion of Man’; আর মাস দেড়েক আগে জার্মানীতে ব’সে ইংরেজীতে লিখে-ছিলেন এক দীর্ঘ কবিতা ‘The Child’। তবু কেন এই আততি? বক্তৃতায় যে মানুষের কথা বলেছিলেন, তারই জয়ধ্বনি শুনিয়েছিলেন কবিতায়। তার পর যখন রাশিয়ায় গেলেন, সেই মানুষেরই মহিমা দেখলেন। তবু কেন আততি?

এর এক আত্মগত অংশ যে ছিল সেটা জানা যায় ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ থেকে। এখানেও তার ইংগিত আছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সূচনায়। তাতে দেখি বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের আত্মবিরোধ, এক আমির বিরুদ্ধে আর এক আমির অন্তর্ঘাত। আত্ম যেহেতু বিশ্বগত, বিশ্বাতীত কিংবা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেহেতু তার পক্ষে অসম্ভব, তাই সকল আত্মবিরোধেরই

একটা বিষয়গত পটভূমি থেকে যায়। কেন যে এক আমি আর এক আমিকে অভিভূত ক'রে ফেলে, ভেঙে দেয় অন্তস্তলের ধ্যান, জাগিয়ে তোলে অস্থিরতা, কেন এক অন্তর্মুখীন ও স্বভাবত নিঃসঙ্গ কবি কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণে বারংবার নিষ্ক্রান্ত হন এবং ফিরে যেতে চান কেন্দ্রে—তার উত্তর মেলে ঐ পটভূমিতে। অভাবগ্রস্ত 'বিশ্বভারতী', আর্ত ভারতবর্ষ ও সভ্যতার সমকালীন সংকট—এক্ষেত্রে সেই পটভূমি। রাশিয়া ত্যাগ ক'রে বার্লিনে পৌঁছে কবি নির্মলকুমারীকে লেখেন—

"বার্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে। সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কিরকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।
কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা।"[৪৯] ঐ চিঠিরই শেষে আছে এই কথাগুলি—
"তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্র গোছের চিঠি না লিখে এরকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কিরকম তোলপাড় করছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এইরকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেইরকম দুঃখ পাচ্ছি।" এই সেই চিঠি যাতে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ অবস্থাটি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন, ইংরেজের 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার'-এর তথাকথিত গরিমার সঙ্গে পদে পদে তুলনা করেছেন সোভিয়েত শাসনের, স্বদেশের নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন কৃষকদের কথা স্মরণ ক'রে ক্ষোভে ও বেদনায় ফেটে পড়েছেন এবং তুলনায় সোভিয়েতের সাফল্যকে বলেছেন 'আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি'।
অধ্যাপক পেত্রভের সঙ্গে ১৩ই সেপ্টেম্বরের আলোচনার শুরুতে কবি বলেছিলেন—

"আজকের দিনে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষ এখন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সেখানে গভর্নমেণ্ট আর জনগণের মধ্যে চলেছে সংগ্রাম। এই পরিবেশে সন্দিগ্ধ গভর্নমেণ্ট অতি সতর্ক। অত্যন্ত নির্দোষ ঘটনা, যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই যোগ নেই, তাও প্রচার বলে ধরা হয়, মনে হয় বুঝি লুকিয়ে চুরিয়ে বিপ্লবের সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থায় কোনরকম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া নেওয়া চলে না। ...ভারতবর্ষ এখন এমন পরিবেশে রয়েছে যে আমরা যদি এমন কিছু করি যার সঙ্গে আপনাদের দেশের স্বল্পতম সম্পর্কও আছে তবে তার অর্থ অত্যন্ত বিকৃত করা হবে। ওরা বলবে, এ হল বিপ্লবের ভাবধারা প্রচারের কাজ চালানর আড়াল মাত্র, মুখোশ। আপনারা তো জানেনই আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই সন্দেহ যাঁদের উপর পড়েছে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের হাতে তাঁদের কী সইতে হয়েছে। তাঁরা জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছেন। আমার এদেশে আসাটা আমার পক্ষে খুবই সাহসের কাজ। কিন্তু এপথে বেশিদূর যাওয়াটা উচিত হবে না। আমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য হল —শিক্ষার আলোকবিস্তার। আমি পোলিটিশিয়ান নই।"[৫০]

কবি চান নি রাজনীতি কোনোভাবে বিচলিত ক'রে দিক তাঁর শিক্ষা-সাধনা, বিপর্যস্ত ক'রে দিক তাঁর শিক্ষাসত্র। কিন্তু এমনই এক সময়ে ও পরিবেশে ঐ সাধনায় তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড টানে তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি তাতে সাড়া না দিয়ে পারেন নি, পারেন নি চোখ-কান বুজে নির্বিকার হয়ে যেতে। এই বৃত্তান্ত কারো অজানা নয়। অভূতপূর্ব নয় এই জাতীয় আততিও। 'রাশিয়ার চিঠি'-কে বুঝতে হবে এই আলোকে। বুঝতে হবে কেন রবীন্দ্রনাথকে—'বড়ো ইংরেজে'র উপর যাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তখনও অগাধ এবং অবিচলিত—বলতে হল, "প্রায় সত্তর বছর বয়স আমার হল—এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি।" কেনই বা তাঁকে বলতে হল—"আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।" চমকে উঠতে হয় এই শপথ প'ড়ে। তবে কি তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল?

অথবা ভিতরে ভিতরে কি ভেঙে পড়ছিল তাঁর ধৈর্যের অবরোধ? না হলে কেন তাঁকে অকস্মাৎ উচ্চারণ করতে হল ঐ শপথ—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-কে উপলক্ষ ক'রে এক প্রগাঢ় স্বগতোক্তি যেন? প্রিয় হবার জন্য সত্যকে তো কখনো তিনি গোপন করেন নি। বরং ঐ কারণেই রাজভক্ত ইংরেজের অপ্রিয় হয়েছেন, নিন্দিত হয়েছেন জাপানে, আমেরিকায় উপেক্ষিত; ঐ কারণেই তো তিনি নিজভূমেও সমালোচিত হয়েছেন। রাশিয়ায় গিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে নানাজনকে চিঠিতে যখন তাঁর নূতন অভিজ্ঞতার কথা লিখছিলেন, তখন, কেন তাঁকে অঙ্গীকার করতে হল ঐ শপথ? তাঁর অন্তর্জগতে পৌঁছতে হলে ঐ শপথকে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। কবি যেন নিজের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করছিলেন, আর সেই বোঝা-পড়া থেকে উঠে এসেছিল এই উচ্চারণ—দাহময় কিন্তু অরোধ্য। মন যখন স্বদেশের দুঃখে মথিত, বিদেশী শাসনের নিদারুণতায় ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত, তখন রাশিয়ায় মানবসাধারণের মুক্তি ও জাগরণ প্রত্যক্ষ ক'রে অহরহ তাঁর মনে হয়েছে স্বদেশের কথা। সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসন ও কমিউনিস্ট শাসনের বৈপরীত্য তাঁর চিত্তে এমনই প্রবল প্রক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যে, অনিবার্য-ভাবে আত্মদর্শী হয়ে উঠেছিলেন কবি। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার প্রশংসায় যখন লেখনীকে অবাধ না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না, তখন ঐ শপথের ঘোষণায় যেন আত্মরক্ষার এক প্রাচীর গ'ড়ে নিয়েছিলেন। যখন দেখি 'রাশিয়ার চিঠি' শুধুই সাময়িক প্রতিক্রিয়া নয়, অভিনব উপলব্ধির আলো অনিঃশেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে চিঠির পর চিঠিতে, তখন অনম্য হয়ে ওঠে ঐ ধারণা। উপলব্ধির তল ও ব্যাপ্তি হিসেব করবার আগে দেখে নেওয়া দরকার সেই নূতন সমাজকে—যাকে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন দেখে-ছিলেন এবং যতটুকু দেখেছিলেন।

"অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।"[৫১]

এই কথাগুলি আছে মস্কো থেকে লেখা দ্বিতীয় চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদে. কিন্তু বইতে রবীন্দ্রনাথ কালক্রম ভেঙে চিঠিটা নিয়ে এসেছেন প্রথমে।

Scanned with CamScanner

সমাজতান্ত্রিক দেশ বাকি দুনিয়া থেকে স্বতন্ত্র। ঐ স্বাতন্ত্র্য নিছক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ও অর্থব্যবস্থায়ই নয়, আরো অনেক গভীরে—বলা যেতে পারে মানুষ সম্বন্ধে চেতনায়, অতএব আচরণেও। সকল মানুষকে সমান ক'রে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে—এই কথাটিতে লেখক সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, আর সেকারণেই একে স্থাপন করেছেন প্রথমে।

সকল মানুষের জাগরণের বর্ণনা আছে চার নম্বর চিঠিতে।—

"রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও সৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে-কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোশাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা।...যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়াঢাকা পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে।...এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই কটা বছরেই।"[৫২]

আবহমান কাল যারা ছিল নেপথ্যে তাদের এই মর্যাদাময় গরিমাময় আত্মপ্রকাশ, অভ্যুত্থান, কবির কল্পনাকে উত্তেজিত করেছে আট নম্বর চিঠিতে।—

"শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে; এখানে তাই হল। দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর-দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।"[৫৩]

কথাটা অন্যভাবে বলেছেন তের নম্বর চিঠিতে।—

"যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্র-সাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা আরাম জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোলো আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ জন-

সাধারণ ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়—সকল অধ্যায়েই এরা।”[৫৪]

পৃথিবীতে এমন দেশ কখনো ছিল না; এমন দেশের স্বপ্ন দেখেছে মানুষ অনেক দিন—কিন্তু সম্ভব ব'লে মনে করে নি মুষ্টিমেয় ভাবুক ভিন্ন কেউ, এতকাল অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছেও। সেই স্বপ্নকে তিনি সজীব রূপে দেখলেন রাশিয়ায়। দেখলেন—সৃষ্টিছাড়া ঐ দেশে বৈষম্য বিতাড়িত এবং শ্রেণী তিরোহিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি অর্থশাস্ত্র যেভাবে বলে, যে ভাষায় বলে—সে ভাষায় তাঁর কথা তিনি বলেন নি। তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষায় ও ভঙ্গিতে অথচ মোক্ষম ভাবে, স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞার বলে সপ্তমপত্রে সমাজ-তন্ত্রের সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।[৫৫] প্রতিভাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে অপূর্বনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা। প্রতিভা অনুকরণ করে না, সৃষ্টি করে; সেই সৃষ্টিতে মিলে যায় অনেক বিসদৃশ উপাদান, তাঁর আত্তীকরণের আশ্চর্য শক্তিতে অপাবৃত হয় বিভিন্নের মধ্যে সংগতি। অভ্যস্ত ঔপনিষদ সংস্কারের আলোয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে বুঝে নেবার, বুঝিয়ে দেবার যে চেষ্টা দেখি ঐ চিঠিতে সে তো ঐ প্রজ্ঞাই। কোনো পক্ষেরই পণ্ডিতী শৃঙ্খলায় তাকে গ্রহণযোগ্য মনে হবে না; কেন না উপনিষদ কি সমাজতন্ত্র—কারো প্রতিই কবি সুবিচার করেন নি, নিজের মতো ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন দুটিকেই। কিন্তু কী এসে যায় তাতে? সত্যের সন্ধান ও বোধ হল আসল কথা; আর লেখকের যা কাম্য তা হল সেই সত্যোপলব্ধির প্রকাশ, পাঠকের চিত্তে তাকে পেঁ ৗছে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্র নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করছেন না, একান্ত ব্যক্তিগত উপ-লব্ধিকে সাধারণের বোধগম্য ক'রে তুলতে চেয়েছেন। যে-ভাষায় ও যে-ভাবানুষঙ্গে তিনি সমাজতন্ত্রের অন্তঃসার ব্যাখ্যা করেছেন তা যেহেতু প্রথাগত নয়, নয় শাস্ত্রানুগ, সেহেতু পণ্ডিতের শুচিবাই ক্ষুব্ধ হতে পারে; কিন্তু সন্দেহ নেই, পাঠকের কাছে জ্ঞাপনে লেখক ব্যর্থ হন নি। শ্রেণীহীন সমাজের সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়, তার ভিত্তিগত ঐক্যবোধ, ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার মৌলিক প্রভেদ—মোটের উপর প্রকাশ পেয়েছে।

রাশিয়া থেকে প্রথম চিঠিতে কবি লিখেছিলেন—

"এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে।"[৫৬]

কিভাবে তিরোভূত হল 'ধনগরিমার ইতরতা'—তার ব্যাখ্যায় তিনি প্রবৃত্ত হন নি; কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন যে কেবলমাত্র ঐ কারণেই সম্ভব হয়েছে তা বেশ জোর দিয়ে বলেছেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার সামাজিক পরিবর্তন তিনি দু-চোখ ভ'রে দেখেছেন, মন-প্রাণ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। চিঠির পর চিঠিতে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা যখন দিয়েছেন তখন শুধু বিষয়ই মূর্তি পায় নি, সেই সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে গেছে লেখকের মনন ও মনস্ক্রিয়া। সেকথা আপাতত নয়, আপাতত আমাদের আগ্রহ ঐ আত্মপ্রকাশের মূলে আছে যে অভিজ্ঞতা তাতে।

"এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে।"[৫৭]

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার প্রশ্নে তাঁর আগ্রহ ছিল সব থেকে বেশি। রাশিয়ায় পেঁছিবার পাঁচ দিন পর কবি লিখেছিলেন—

"আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম! শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে

শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সায়ন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।"[৫৮]

আমেরিকার পথে যাত্রা ক'রে জাহাজ থেকে লিখেছিলেন—

"শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই—'ভুধু ভাতু খায় সেই'। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেন না সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়।"[৫৯]

অন্য এক চিঠিতে লিখেছেন—

"...দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ায় জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল; সোভিয়েট শাসনে এই জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্র-কলা সমস্তই আছে—অর্থাৎ, আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।"[৬০]

সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষার হাল-চাল সম্বন্ধে আরো অনেক কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। সবিস্তারে জানিয়েছেন কিভাবে কমিউনিস্ট শাসনে পিছিয়ে-পড়া জাতি-উপজাতিরা শিক্ষিত হয়ে উঠছিল, প্রশাসনের ও ব্যবস্থাপনার সব রকমের অসুবিধা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট সরকার কী আন্তরিকতায় ও ব্যাপকতায় শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে। উদ্দেশ্য ও উপায়, সর্বতোমুখিতা ও সম্পূর্ণতা, প্রযত্ন ও প্রকর্ষ—এক কথায় সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্তই তিনি দেখেছিলেন, দেখেছিলেন ক্ষুধিত দৃষ্টিতে, দেখেছিলেন তন্ন তন্ন ক'রে। যখন দেখেছেন বহুনিন্দিত কমিউনিস্ট শাসনে বন্যার মতো বেগে সহস্রধারায় প্রবাহিত হচ্ছে শিক্ষা, আর তার ফলে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যুগ যুগ ধ'রে অবহেলিত অপমানিত মানুষের দল, তখন তাঁর মনে যুগপৎ জেগেছে আনন্দ ও বেদনা। আনন্দ ওদেশের সাফল্যে, আর তাঁর দুর্গত স্বদেশের কথা ভেবে বেদনা। আমরা

Scanned with CamScanner

টের পাই, এই বেদনা নিষ্ক্রিয় ভাবুকের নয়; আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝি, 'রাশিয়ার চিঠি' শুধু রাশিয়ারই নয়—ভারতেরও চিঠি। কবি যা দেখেছিলেন তা তাঁর স্বপ্নের রূপায়ণ—যে স্বপ্ন বহুদিনের, যাকে রূপ দেবার চেষ্টা তিনি করেছেন ব্যক্তিগত সামর্থ্যে ও উদ্যোগে। তাই আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়েছেন যেন। আর স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, হাজার কথায় তাকে নিশ্চেতন দেশের কাছে বোধগম্য ক'রে তোলবার নিষ্ফলতা নয়—সোভিয়েত রাশিয়ায় তার বাস্তব-রূপ তিনি দেখলেন, যাকে বলে পাওয়া ঠিক তাই ঘটল তাঁর জীবনে। সোভিয়েত লেখকদের সভায় তিনি তাঁর এই মহার্ঘ্য প্রাপ্তির ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন—

"ব্যক্তিগতভাবে আমিও আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজের মতো করে কাজ করে চলেছি, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মত হল তাকে জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে; তাকে জীবনের অংশ হতে হবে। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় যথার্থ জীবনধারণের ফলেই, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয় যা সভ্য জগতের ইস্কুল কলেজে প্রায়ই ঘটে—সে যেন এক খাঁচা, তার ভিতরে শিশুদের যত কৃত্রিম পথ্য যোগান হয়। যথার্থ জীবনের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারি।

এই ধারণাটাকে আমি আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে এসে দেখছি আপনাদের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে আমার অদর্শের খুবই মিল রয়েছে; দেখেছি মানুষ এখানে জীবনের পূর্ণতায় বেঁচে আছে, তার মধ্যে দিয়ে তাদের মন শুধু বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক তালিম বা তথ্য নয়, শিক্ষার পূর্ণতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে।

তাদের বুদ্ধিকে আপনারা উদ্বুদ্ধ করেছেন সৃষ্টির কাজে, যা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন। এর জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আমারও স্বপ্ন তাই। কিন্তু একার পক্ষে আমার প্রতিষ্ঠানে এই আদর্শকে যথোপযুক্তভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। আপনাদের দেশে আপনারা তাকে যথার্থ রূপ দিতে পেরেছেন, প্রয়োজনীয় গতিবেগ ও উৎসাহ দিয়ে তাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। আমার ধারণা, মানবজাতির প্রতি আপনাদের দেশের

এটি একটি অক্ষয় উপহার—লোকশিক্ষার এই আদর্শ।"[৬১]
রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার শুধু প্রশংসাই কবি করেন নি, সমালোচনাও করছেন 'ছাঁচে-ঢালা' ব'লে। ছাঁচে-ঢালা শিক্ষায় যে একদিন ওদের বিপদ ঘটবে একথা বলেছেন জোরের সঙ্গে। তবু যা বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা এই যে, নিজের মতে সুস্থিত থেকেও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শিক্ষার বিকিরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ 'প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ' রোধ করতে পারেন নি। তাঁর নিজস্ব মতের মতোই মূল্যবান মনে হয় তাঁর উল্লাসকে; কেননা তাতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মন—যে মন নিজের অভিমতকে গারদ ক'রে তোলে নি; প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উত্তরণশীলতা। তাঁর ঐ আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও স্বদেশের জন্য অশ্রুপাত—এই সব মিলিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর মনের গতি, যা সন্দেহ নেই নূতন সমাজের অভিমুখীন।
সোভিয়েত দেশে শুধুমাত্র শিক্ষার বিপুল প্রসার দেখেই যে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, তার থেকেও বড়ো কথা তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন সেদেশের শিক্ষার সর্বাঙ্গীণতায় ও সম্পূর্ণতায়, জীবনধর্মিতায় ও সৃজনশীলতায়। সেকথা ব্যাখ্যা ক'রে তাঁর মন্তব্য—
"এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করাবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়।"[৬২] ঐ চিঠিতেই আরো লিখেছেন—

"হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়, সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ-অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়-কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাও-রাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন—তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা,

Scanned with CamScanner

দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধূলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায়।

আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্‌টয়ের রিসারেক্‌শান। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল।"

১৯২৭ সালে অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল জওহরলাল নেহেরুর। তাঁর প্রতীতিও কবির থেকে ভিন্ন নয়। আর একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন—

"সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এত দিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নিচে তলিয়ে গেছে একথা সত্য, কিন্তু টিকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়াম থিয়েটার লাইব্রেরি সংগীতশালা।[৬৩]

সব দেখে শুনে তাঁর সিদ্ধান্ত—

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা।"[৬৪]

Scanned with CamScanner

শিক্ষা নিয়ে যেমন তেমনি কৃষি ও কৃষকদের নিয়েও দীর্ঘদিন ধ'রে ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সেই ভাবনা অনুযায়ী কাজ করেছেন। সারা দেশ যখন অন্য চিন্তায় মথিত, স্বাধীনতার সংগ্রামে একাগ্রচিত্ত, তখনও তাঁর সেই কাজকে তিনি গণ্য করেছেন আশু কর্তব্য ব'লে। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষি ও কৃষকদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন দেখে, অত্যাশ্চর্য উন্নতি দেখে, তিনি মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছিলেন। নূতন রাশিয়াকে যখন তিনি দেখছিলেন তখন স্বদেশের নিরন্ন নিঃসহায় নিরক্ষর কৃষকদের ছবি কেবলই তার মনে পড়ছিল, তাদের কথা ভেবে বেদনায় ও ক্ষোভে জীর্ণ হচ্ছিল তাঁর মন। সেকথা অকপটে জানিয়েছিলেন ২৪শে সেপ্টেম্বরের একটি ভাষণে। আরো বলেছিলেন—

"The little that I have seen has convinced me of the marvellous progress that has been made, the miracle that has been achieved. How the mental attitude of the people has been changed in such a short time, it is difficult for us to realize, we who live in the darkest shadow of ignorance and futility. It gladdens my heart to know that the people, the real people who maintain the life of society and bear the burden of civilizatson, are not deprived of their own rights and that they enjoy an equal share of all the advantages of a progressive community."[৬৫]

মস্কোতে কবি একদিন কৃষিভবনে গিয়েছিলেন। সেখানে রাশিয়ার নানা অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল 'Collective Farming' কবির ভাষায় ঐকত্রিক কৃষি। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, নতুন ব্যবস্থায় জবরদস্তি হচ্ছে কিনা। স্পষ্টভাষায় তাঁরা না বললেও ঐকত্রিকতা নিয়ে কৃষকদের মধ্যে মতভেদ ও দ্বিধা তাঁর চোখে পড়েছিল। চোখে পড়েছিল আরো যা তা হল এই—

"সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখেনি ; ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে।"[৬৬]

Scanned with CamScanner

সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষির আধুনিকীকরণের পরিচয় দিয়ে কবি মন্তব্য করেছেন—

"কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে।"[৬৭]

কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার সময় কবি তাঁদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। সাইবেরিয়ার এক কৃষক রমণী তখন বলেছিলেন—

"সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো, ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে।"[৬৮]

জনৈকা ককেশীয় যুবতী বলেছিলেন—

"...আমরা ককেশীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি।"[৬৯]

কবির মনে সন্দেহ জেগেছিল, সোভিয়েত দেশ হয়তো পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারী দায়িত্ব ক'রে তুলতে চায়। একত্রীকরণের নীতি ও পরিবারের মধ্যে বিরোধের প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছিল। সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের ছবিটাও যে বদলে যাচ্ছিল—গিয়েছিল, বদলে গিয়েছিল পরিবারে ও সমাজে নারীর স্থান, এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। জওহরলাল নেহেরুর সমীক্ষণ অন্তত আমাদের এই সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলে দেয়।"[৭০]

সোভিয়েত সমাজ যে অভিনব দৃষ্টিতে শিশুকে দেখেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কবি।—

"শিশু জারজ কিম্বা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে পর্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের। বাড়িতে

তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময়-পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক-বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কি-রকম আছে, পড়াশুনো কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে, তা হলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারি অভিভাবক-বিভাগের উপর।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের, তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐ রকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্ট-সাধারণেরই সুযোগ-সুবিধার জন্যে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়। অতএব তাদের জন্যে দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্যে কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না।"[১১] কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কবির মনঃপূত হয় নি। তাই তাঁর মন্তব্য—

"..মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো।"

সোভিয়েত রাশিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থা অবশ্য তাঁকে অভিভূত করেছিল। শিক্ষা ও কৃষির বিষয়ে যেমন, তেমনি স্বাস্থ্য বিষয়েও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গি, উদ্যোগ ও আয়োজন দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাশিয়ার স্বাস্থ্য-

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থাকে তিনি দেখেছিলেন সেদেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। যথাসম্ভব দেখে ও জেনে একাধিক চিঠিতে সেই ব্যবস্থার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তখন অনিবার্যভাবে ভারতের কথা মনে পড়েছে ; আক্ষেপ ও ক্ষোভ গোপন থাকে নি। দীর্ঘশ্বাস সহ লিখেছেন—

"রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা আজও হয় নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ—কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না স্বাস্থ্যও না।"[৭২]

সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে খুশী করেছিল নানা দিক থেকে। তেমনি একটি দিক হল তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিভিন্নতা সত্ত্বেও সংহতি। বহু বিচিত্র জাতি-উপজাতির বাস ওদেশে। তাদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, উন্নয়নের মান—নানা রকমের। জারের আমলে পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষ, অনৈক্য ও অবিশ্বাস এক ভয়াবহ সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। সেই বিশ্লিষ্ট বহুকে সোভিয়েত সরকার ঐক্যবদ্ধ করেছে, প্রীতিবদ্ধ করেছে। তাদের সকলের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে নূতন চেতনা ও নূতন জীবনের আবেগ। কবি তাই মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে লিখেছেন—

"রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এত বড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি।...

এবারে ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেছে। চোখে দেখলুম। এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই।"[৭৩]

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা যে ভারতের সাধনা, একথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এই বিশ্বাস

থেকে তিনি চালিত হয়েছেন। অথচ তাঁর জীবনকালে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে দেখেছেন সেই বিশ্বাসের লাঞ্ছনা। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা তাঁর চিন্তার একটি প্রধান বিষয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় অনুরূপ সমস্যার সমাধান দেখে তিনি লিখেছেন—

"আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতি-কুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে।"[৭৪]

কবির ভালো লেগেছিল ঐ মূল শুদ্ধ উৎপাটন। সাম্প্রদায়িকতার মূলে যে ধর্মমূঢ়তা, সোভিয়েত সরকার সেই মূঢ়তা থেকে উদ্ধার করেছে দেশের কোটি কোটি চাষী মজুরকে। কবির মনে হয়েছে, সে যেন আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। সাত নম্বর চিঠিতে লিখেছেন—

"যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধন-জর্জর জাতিকে এত অল্প কালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তি-শেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটেরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যতই নিন্দা করুক

আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।"[৭৫]

বিষকন্যার উপমা মনে পড়িয়ে দেয় মার্ক্সের বিখ্যাত আফিমের উপমা। উদ্ধৃত ঘোষণা যিনি করেছেন, আমরা জানি, ধর্মমোহ কি নাস্তিকতা কোনোটিই তাঁর মধ্যে ছিল না। নিঃসংশয় ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়েই মানুষের স্বার্থে তিনি যে কতদূর যেতে পারেন, তার সুনিশ্চিত দিকচিহ্ন এই মন্তব্য। রবীন্দ্রনাথের দেবতা মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম তাঁর নিজেরই কথায় মানুষের ধর্ম। মানুষকে যেখানে দেখেছেন স্বমহিম সেখানে তিনি দেখেছেন দেবতাকে। তা যদি না হত তবে তাঁর মতো ঈশ্বরগতপ্রাণ ও উদারনীতিকের পক্ষে বলা সম্ভব হত না—"....রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

সুতরাং সন্দেহ নেই, সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থাই শুধু নয়, জবরদস্তি ও একনায়কতন্ত্রে ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রও রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতার এবং উল্লাসের কারণ। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সেদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখতে এবং যা দেখে ভুলেছিলেন তা হল শিক্ষার বিকিরণ—এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে বিদ্বজ্জনদের মধ্যেও। ধারণাটা যে ভুল তা নয়, তবে আংশিক। আর, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রটিকে উপেক্ষা ক'রে কবির মুগ্ধতার কারণ হিসেবে যদি কেবলমাত্র শিক্ষার কথাই বলা হয় তবে তা উদ্দেশ্যমূলকও।

রাশিয়ায় গিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে আলাপে-আলোচনায়, লেখায় ও সাক্ষাৎকারে, খুব সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করতে হয়েছিল কবিকে। কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের দায়ে ইংরেজ সরকার যাতে কোনো ভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করতে না পারে এবং সেই সূত্রে তাঁর বিশ্বভারতীর স্বার্থ যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় এই চিন্তা তাঁর ছিল। অধ্যাপক পেত্রভের সঙ্গে ১৩ই সেপ্টেম্বরের আলাপে সেকথা তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন। তবু 'রাশিয়ার চিঠি'-তে যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন, তাতে তাঁর আনন্দ ও সমর্থন কিছু কম প্রকাশ পায় নি। আর যেকথা চিঠিতে লেখেন নি বা

লিখতে পারেন নি, তার দ্বিধাহীন উচ্চারণ দেখি আলাপে ও ভাষণে। ২৪শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক পেত্রভের সঙ্গে আলাপে কবি যা বলেছিলেন তার কিয়দংশ দেখা যাক।—

১. "আপনারা যে শুধু নিজেদের সমস্যার সমাধান করছেন তা নয়, আপনারা সমগ্রভাবে জগৎ সমস্যার কথাই ভাবছেন, আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেদের গঠন কর্মে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। আমার কাছে এর মূল্যই সব চেয়ে বেশি। এতে প্রচণ্ড সাহসের দরকার, এর তাৎপর্য বৃহৎ।"

২. "আমার কৌতূহলের প্রধান বিষয় হল লোকশিক্ষা। আপনারা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়েছেন, এ ঘটনা এখনই তেমন কিছু প্রত্যক্ষ ফল দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, এককালের শোষিত উৎপীড়িত জনসাধারণের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে কাজে লাগান—এ আপনাদের বিরাট কীর্তি। এ কীর্তি সবচেয়ে ভালো ফল না দিয়ে পারে না, জগৎটাকে আরো নিখুঁত করে তোলার সুযোগ তা দেবেই।"

৩. "আমি রাশিয়ায় এসেছি শিখতে; আপনাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থা, সর্বসাধারণের জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজ, ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে, কারণ আমি মনে করি স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গটুকুও, ব্যক্তিত্বের মুক্তির সামান্যতম বিকাশও ভাবীকালের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ যদি আমরা অল্প কিছুও করতে পারি, একটি ছোট ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রচেষ্টা সংহত হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই স্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যতে সোশিয়ালিজমে বিকাশ পাবে।"[৭৬]

কবির বক্তব্যের এই শ্রুতলিপি যদি যথাযথ হয় তবে এ এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'Modern Review' পত্রিকায়, তার পরে 'Visva Bharati Bulletin'-এ। শেষে তা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে সংযুক্ত হয়েছে 'Letters from Russia' গ্রন্থের পরিশিষ্টে। এর সঙ্গে সোভিয়েত দেশ থেকে প্রকাশিত নথিপত্র মিলিয়ে পড়লে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে,

Scanned with CamScanner

সোভিয়েত প্রকাশনায় কোনো বিকৃতি ঘটে নি। কিন্তু একই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, কবির সঙ্গীরা যে বিবরণ প্রস্তুত করেছিলেন এবং যা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কি সমস্তই স্থান পেয়েছে? উপরে উদ্ধৃত পেত্রভের সঙ্গে ২৪শে সেপ্টেম্বরের আলোচনা যেহেতু বিশ্বভারতীর প্রকাশনায় দেখি না সেহেতু প্রশ্ন জাগে। সেদিন যেহেতু সব কথা প্রকাশযোগ্য ছিল না সেহেতু সন্দেহ প্রশ্রয় পায়। কবির আলোচনা ও ভাষণের অনুলিপি রাখতেন তাঁর সঙ্গীরা। সেই অনুলিপিগুলির ও 'নোট্‌সে'র সন্ধান না পাওয়ায় সব কিছু মিলিয়ে দেখার, যাচাই করার আজ আর কোনো উপায় নেই। তবু উপরে উদ্ধৃত কবির বক্তব্য সন্দেহযোগ্য মনে হয় না। কেননা তার সমর্থন মেলে ২৪শে সেপ্টেম্বর ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে প্রদত্ত কবির ভাষণে। কবি সেদিন বলেছিলেন—

"আমাদের দেশের লোক নিত্য দুর্ভিক্ষের মুখে রয়েছেন। নিজেদের মনুষ্যত্বে তাঁদের বিশ্বাস ভরসা নেই বলে তারা এর কোন প্রতিকার জানে না। এই বিরাট জনসমষ্টির এ হল বৃহত্তম দুর্ভাগ্য, গভীর অজ্ঞতা আর অসহায়তার ভারে পীড়িত তিরিশ কোটি নরনারী।

তাই আমি এসেছি দেখতে এই সমস্যাকে কীভাবে আপনারা দূর করছেন, কেমন করে আপনারা লড়াই করেছেন এদেশের মজুর ও চাষীদের মধ্যে অজ্ঞানের উৎস, কুসংস্কার আর অনীহার বিরুদ্ধে। যেটুকু দেখলুম তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আপনারা অপূর্ব প্রগতি সাধন করেছেন, অত্যাশ্চর্যকে সম্ভব করেছেন। আমরা অজ্ঞান ও অক্ষমতার নিবিড় ছায়ায় পড়ে আছি, আমাদের পক্ষে তাই বোঝা কঠিন এত অল্প সময়ে আপনাদের জনসাধারণের মনের বদল কী করে ঘটান গেল। একথা জেনে খুবই আনন্দ পেলুম, যে-জনগণ সমাজজীবনের ভিত্তি, সে-জনগণ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়। সোশিয়ালিস্ট সমাজের সব সুখ-সুবিধারই তাঁরা সমান অংশীদার।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবেন। আমার বহু দিনের স্বপ্ন,

যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"[৭৭]

ইংরেজীতে প্রদত্ত এই ভাষণের কিছু অংশ পূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে। দুটি মিলিয়ে দেখলে একটিমাত্র পার্থক্য চোখে পড়ে। 'Modern Review' পত্রিকায় ও 'Letters from Russia'-র পরিশিষ্টে যা ছিল 'Progressive Community', সোভিয়েত প্রকাশনার বঙ্গানুবাদে তা হয়েছে 'সোশিয়ালিস্ট সমাজ'। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়াকে দেখেছিলেন মস্কোয় থেকে এবং সরকারী আতিথ্যে। মাত্র পনের দিনের সেই দেখা। কাজেই তার গভীরতা ও যথাযথতা তর্কাতীত নাও হতে পারে।[৭৮] সমাজতন্ত্রের কতটুকু তিনি বুঝেছিলেন, যা বুঝেছিলেন তার কতটা ঠিক আর কতটা বেঠিক—তা নিয়েও তর্ক হতে পারে। কিন্তু সেই তর্ক একালের পাঠককে পৌঁছে দেবে না পূর্বকালের কবির অন্তরে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ দেখে রবীন্দ্রনাথ উৎফুল্ল হয়েছিলেন এবং কোনো কোনো দিক থেকে তার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর অর্থ এই নয় যে, রাশিয়ায় গিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রী অথবা কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছিলেন—যদিও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, কথোপকথনের সময় কখনো কখনো কবি নিজেকে কমিউনিস্ট বলতেন।[৭৯] বলা বাহুল্য, সে কথার কথা। সমাজতন্ত্রে এবং রুশ দেশের বৈপ্লবিক পন্থায় তাঁর সর্বাঙ্গীণ সম্মতি ছিল না। কোনো কোনো বিষয়ে অনম্য আপত্তিও ছিল। কিন্তু যা দেখেছিলেন রাশিয়ায়, তাতে অব্যবহিতভাবেই খর্ব হয়ে গিয়েছিল তাঁর আপত্তির প্রতিপত্তি।

নানা প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অনর্গল ও অজস্র প্রশংসা যেমন কবি করেছেন, তেমনি নির্দ্বিধায় জ্ঞাপন করেছেন নিজস্ব বিরুদ্ধ মত। রবীন্দ্রনাথ মস্কো ছেড়ে আসেন ২৫শে সেপ্টেম্বর। আসবার আগে 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ এই—

"But I find here certain contradictions to the great mission which you have undertaken. Certain attitudes of mind are being cultivated which are contrary to your ideal.

I must ask you : 'Are you doing your ideal a service by arousing in the minds of those under your training, anger, class-hatred and revengefulness against those whom you consider to be your enemies ? 'True, you have to fight against obstacles. You have to overcome ignorance and lack of sympathy, even persistently virulent antagonism. But your mission is not restricted to your own nation or own party, it is for the betterment of humanity according to your light. But does not humanity include those who do not agree with your aim ? Just as you try to help peasants who have other ideas than yours about religion, economics and social life, not by getting fatally angry with them, but by patiently teaching them and showing them where the evil lurks in secret, should you not have the same mission to those other people who have other ideals than your own ? These you may consider to be mistaken ideals, but they have an historical origin and have become inevitable through a combination of circumstances. You may consider the men who hold them as misguided. But it should all the more be your mission to try to convert them by pity and love, realizing that they are as much a part of humanity as the peasants whom you serve.

If you dwell too much upon the evil elements of your opponents, and assume that they are inherent in their human nature meriting eternal damnation, you inspire an attitude of mind which with its content of hatred and revengefulness may some day react against your own ideal and destroy it. You are working in a great cause. Therefore, you must be great in your mind, great in your mercy, your understanding and your patience....

There must be disagreement where minds are allowed to be free. It would not only be an uniteresting but a sterile world of mechanical regularity if all of our opinions were forcibly made alike. If you have a mission which includes all humanity, you

must for the sake of that living humanity acknowledge the existence of differences of opinion. Opinions are constantly changed only through the free circulation of intellectual forces and moral persuasion. Violence begets violence and blind stupidity. Freedom of mind is needed for the reception of truth : terror hopelessly kills it. The brute cannot subdue the brute, It is only the man who can do it.

Therefore, for the sake of humanity I hope that you may never create a vicious force of violence which will go on weaving an interminable chain of violence and cruelty...Your ideal is great and so I ask you for perfection in serving it, and a broad field of freedom for laying its permanent foundation."[৮০]

এই সমালোচনা নিছক সমালোচনা নয়, আবেদন এবং বিশ্বাসে পূর্ণ প্রত্যাশাও। 'রাশিয়ার চিঠি'-তেও স্থানে স্থানে কবির আপত্তি ও সমালোচনা আছে, তবে তার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একই স্বরগ্রাম ও স্বরায়ণ লক্ষ্য করি না। এদিক থেকে চৌদ্দটি চিঠি ও 'উপসংহার'-এ তফাত আছে। রাশিয়া থেকে কবি বার্লিনে ফিরে যান। সেখান থেকে শেষ বারের মতো আমেরিকা ঘুরে দেশে ফিরে আসেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী। 'রাশিয়ার চিঠি' বইয়ের এখন যেটা 'উপসংহার' সেটা একটি পৃথক প্রবন্ধ রূপে 'সোভিয়েট নীতি' নামে প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই প্রবন্ধে যে কবি চিঠিগুলির থেকে ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নয়, তবে প্রশস্তি সত্ত্বেও সমালোচনা ও আপত্তি যেন আগের তুলনায় উচ্চগ্রামে। চিঠিগুলির উচ্ছ্বাস ও উল্লাস এতে নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশংসায় অবিচলিত থেকেও সমালোচনার সূত্রগুলিকে লেখক এই প্রবন্ধে বিস্তারিত ও ধারালো ক'রে তুলেছেন। গুণকীর্তন ও ত্রুটির বর্ণনায় যথাসাধ্য ভারসাম্য রাখতে চেয়েছেন যেন। চিঠিতে ও 'উপসংহার'-এ কবিকণ্ঠের যে পার্থক্য তার একটি দৃষ্টান্ত তোলা যাক। 'উপসংহার'-এ একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"দেহ দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু

সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার' এর মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।"[৮১]

'বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার' (মার্ক্স না লেনিন?)—এরকম আঘাতময় উক্তি চিঠিতে নেই। রাশিয়ায় বৈষম্য তিরস্কৃত ও তিরোভূত দেখে তাঁর যে কী বিস্ময় ও আনন্দ হয়েছিল, সে তো আমরা দেখেছি। আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করেছিলেন 'কী অসম্ভব সাহস'। সেই তিনিই 'উপ-সংহার'-এ দোহাই দিচ্ছেন বিধাতার বিধির, সেই বিধিতেই দেখছেন মানুষে মানুষে বৈষম্যকে, ঐ বৈষম্য বিমোচনের চেষ্টায় সাহসের থেকেও মূঢ়তাকে দেখছেন বেশি ক'রে। খুঁটিয়ে দেখলে এমনি আরো অসঙ্গতিপূর্ণ পার্থক্য চোখে পড়ে। তাই প্রশ্ন জাগে, চৌদ্দটি চিঠি ও 'উপসংহার'-এ এই পার্থক্য কেন? এর উত্তর পাই ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে। তাতে কবি জানিয়েছেন—

"প্রবাসীতে যে চিঠিটা বেরিয়েছে বিশেষ কারণে তার জরুরিত্ব আছে। আমার আমেরিকান ও জার্মান বন্ধুরা আমার বলশেভিক পক্ষপাত নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আমার ঠিক মনের ভাবটিকে তাদের অবিলম্বে বোঝানো দরকার। এই চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত।"[৮২]

এই চিঠির তারিখ ৩রা বৈশাখ ১৩৩৮। ঐ মাসেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'সোভিয়েটনীতি'—রবীন্দ্রনাথ যাকে চিঠি ব'লে অভিহিত করেছেন ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা চিঠিতে এবং যা 'উপসংহার' নামে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কেন 'উপসংহার' ও বইয়ের বাকি অংশে স্বরগ্রাম ও স্বরায়ণের পার্থক্য।

এ-প্রসঙ্গে অন্য এক প্রশ্নও ওঠে। কবির জার্মান ও আমেরিকান বন্ধুদের ক্ষোভের উপলক্ষ কি ছিল? রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি বাঙলায় লেখা এবং সেগুলি ছাপা হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়। অতএব এই সব চিঠিই যে

তাঁদের ক্ষোভের উপলক্ষ, তা ভাবা যাচ্ছে না। তা হলে তাঁরা কোন্ সূত্রে জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'বলশেভিক পক্ষপাত' ? রাশিয়া দেখে আমেরিকায় পৌঁছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলে-ছিলেন—

"Russia has wrought a miracle.

I went to Moscow, and found that the sort of instruction that the Russian peasants and workers receive does not make them merely factory hands, but develops them culturally.

Under the Czar, the Russian masses were as ignorant and stupid as the masses of India are to-day. In India only 7 percent of the people are even nominally literate, not educated, just literate. Russia was no better ten years ago.

But now I was vastly impressed by the spread of literacy and elements of true culture, the love for beauty, among the humblest Russians.

Formerly, racial and religious conflicts were common in Russia as they are in India up to this day. Now, in Russia all these conflicts have disappeared. Jews, Armenians, Christians and Moslems have learned to co-operate.

Of course, the Russian authorities use their educational institutions as means to propagate their own economic and political doctrines. But with those views I have no concern. I shall not pass judgement upon economic teachings of anybody, since that is not my field.

It is the Russian method of enlightening the people that interests me.

Russians are not believers in old theologies.

Service of mankind might be their religion."[৮৩]

আশ্চর্য, রাশিয়ার প্রশংসা ছাড়া সামান্যতম সমালোচনাও কবি করলেন না, সমাজতন্ত্র নিয়ে মত প্রকাশ করার দায় এড়িয়ে গেলেন অনধিকার-চর্চার যুক্তিতে এবং একান্ত ক'রে তুলে ধরলেন নব্য রাশিয়ার সাফল্য ও মানবকল্যাণের আদর্শকে। এর পর তাঁর জার্মান ও আমেরিকান বন্ধুদের

Scanned with CamScanner

ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কবিকে যে তাঁরা বলশেভিকদের পক্ষপাতী মনে করেছিলেন দেখা যাচ্ছে তা অমূলক নয়। তাই অযৌক্তিক নয় সেই ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় রচিত 'রাশিয়ার চিঠি'র 'উপসংহার'-কে সতর্ক বিবেচনায় গ্রহণ করা।

'উপসংহার'-এর ঠিক আগের চিঠিতেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি।"[৮৪]

এর আগে নন্দলাল বসুকে লিখেছিলেন—

"সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি; সেজন্যে আহারে বিহারে লোক কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা।"[৮৫]

এই সাবলীল শ্রদ্ধার্ঘ্য, ভিতর থেকে উঠে আসা এই উচ্চারণ, উচ্ছ্বাসপূর্ণ হলেও সহৃদয়তার মূল্যে মণ্ডিত। যিনি সোভিয়েত কমিউনিস্টদের বলেছেন 'সাধক', তাঁদের আরব্ধ কর্মকে বলেছেন 'তপস্যা', তিনি নিঃসন্দেহে নিজস্ব আপত্তির উপরে স্থান দিয়েছেন তাঁদের আদর্শ ও সাধনাকে।

৫.

১৯৩১ সালের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। তখন তাঁর মন-প্রাণ ছেয়ে আছে সোভিয়েত রাশিয়া। পরেও সেই স্মৃতি নানা প্রসঙ্গে উদ্বেল হয়েছে, বিশেষত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমস্যার চিন্তায় যখন আকুল হয়েছেন তখন প্রায়ই তাঁর অন্তস্তল থেকে জেগে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। সেদেশে থাকতেই নির্মীয়মাণ রাশিয়া সম্বন্ধে বই-পত্রের সন্ধান করেছিলেন তিনি। 'ভক্‌স'-এর সভাপতি সানন্দে তার পর থেকে নানা বই ও পত্রিকা তাঁকে পাঠিয়েছেন। নথিপত্র থেকে জানা

যাচ্ছে, নতুন বছরের শুরু থেকেই সে-সব কবির হস্তগত হয়েছে। ১৯৩১ ২১শে এপ্রিল তাঁর একান্ত সচিব আরিয়াম ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছেন 'ভক্‌স'-কে। রাশিয়া থেকে যেসব বই আসত তা প্রধানত ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে। ম্যাকসিম গোর্কি সম্পাদিত 'নির্মীয়মাণ সোভিয়েত ইউনিয়ন' পত্রিকা নিয়মিত আসত। এইসব বইপত্র কবি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। পরবর্তীকালের দুটি চিঠিতে তাঁর স্বীকারোক্তি আছে। ৭ই জুলাই ১৯৩৭ 'ভক্‌স'-এর সভাপতি আ. আরোসভকে তিনি লিখেছিলেন—

"আপনাদের দেশের, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ঘটনাবলীর খুবই খোঁজ রাখি আপনাদের সমিতির বইপত্রের মধ্যে দিয়ে।"[৮৬]

১৯৩৮ সালের ২৯শে আগস্ট 'Internatonal Literature' পত্রিকার সম্পাদককে জানিয়েছিলেন—

"আমি সংস্কৃতি বিষয়ক এইসব বইপত্র গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়ে থাকি। আপনারা আমায় নিয়মিতভাবে তা পাঠাচ্ছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।"[৮৭]

কিন্তু সমাজতন্ত্র বিষয়ে বইপত্র যে তিনি পেতে চেয়েছিলেন কিংবা পাচ্ছিলেন, এমন কোনো সূত্র এই সংযোগ থেকে মিলছে না। অবশ্য ১৯৩৮ সালের ১৮ই নভেম্বরে লেখা অনিল চন্দের একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে, সেবার পাঁচটি বইয়ের একটি চালানে P. Kerzhentsov-এর 'Life of Lenin' ছিল। অনিল চন্দ চিঠিতে জানিয়েছেন যে, গভীর আগ্রহ নিয়ে কবি বইগুলি পড়ছেন। বইটি এখনও বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আছে এবং তার কিছু কিছু লাইনের তলায় পেন্‌সিলের দাগ দেখেছি। কিন্তু সে দাগ যে কবিরই দেওয়া—এরকম সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তবু, অনিল চন্দের সাক্ষ্য ও কবির স্বীকারোক্তিকে কপট সৌজন্য মনে করা অনুচিত। সোভিয়েত রাশিয়া দেখে আসবার পর থেকে সেদেশের সঙ্গে কবির যোগ যেমন দিনে দিনে বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সেদেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য। এই ঔৎসুক্য তো এইজন্যেই যে, সেখানে একটা নতুন সমাজ গড়ে উঠছে, রচিত হচ্ছে মানুষের ভবিষ্যৎ।[৮৮]

রাশিয়ার কমিউনিস্ট প্রশাসনের প্রশংসায় যখন রবীন্দ্রনাথ মুখর, তখনই একটি চিঠিতে দেখি কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব। ১৯৩১ সালের ৩১শে জুলাই দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"যেখানে দারিদ্র্যে মানুষ দুর্বল সেইখানেই যেমন মারী মড়ক জোর পায় তেমনি আজকালকার য়ুরোপে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়চে ততই ফাসিজ্‌ম এবং বল্‌শেভিজ্‌ম জোর পেয়ে উঠ্‌চে। দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানুষের স্বাধীনবুদ্ধিকে জোর করে মেরে তার উপকার করা যায় এসব কথা সুস্থচিত্ত লোকে মনে ভাবতেই পারে না। পেটের জ্বালা বাড়লে তখনই যত দুর্বুদ্ধি মানুষকে পেয়ে বসে। বল্‌শেভিজ্‌ম ভারতে ছড়াবে বলে আশঙ্কা হয়—কেন না অন্নকষ্ট অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে—মরণ-দশা যখন ঘনিয়ে আসে তখন এরা যমের দূত হয়ে দেখা দেয়।···

আর যাই করিস্ এই সব মানুষখেগো দলের সঙ্গে খবরদার মিশিস্ নে। য়ুরোপ আজ নিজের মহত্ত্বকে সব দিকেই প্রতিবাদ করতে বসেচে। আমাদের দেশের লোক—বিশেষ বাঙালী—আর কিছু না পারুক, নকল করতে পারে—তাদের অনেকে আজ য়ুরোপের ব্যামোর নকল করতে লেগেচে। এই নকল মড়কের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলিস্। নিশ্চয় তোদের ওখানে এই সমস্ত দানোয় পাওয়া ভারতবাসী অনেক আছে, তাদের কাছে ভিড়িস্ নে, আপন মনে কাজ করে যাস্।"[৮৯]

হঠাৎ এরকম চিঠি কেন? এখানে মনে রাখা দরকার, মাত্র মাস দুই আগে বই হয়ে বেরিয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি' (২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮)। নীতীন্দ্র-নাথকে চিঠি লেখার মাস খানেক আগে হেমন্তবালা দেবীকে কবি লিখে-ছিলেন—

"মানুষকে অন্নবস্ত্রবিদ্যা, আরোগ্য, শক্তি সাহস দিতে হবে এই সাধনায় যারা আত্মনিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক বা না মানুক তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেচে, সেই মহান আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্মাকে, যাঁকে জান্‌লে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়।··· দেশ বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্মভাই বলেই

জানি। সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাঁদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তাঁরা যে দেশে থাকেন সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক্ এই আমার কামনা।”৯০

এতে সরাসরি কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ না থাকলেও যে 'নাস্তিক ভক্তদের কবি আপন ধর্মভাই' ব'লে উল্লেখ করেছেন রাশিয়ার কমিউনিস্টরা সেই নাস্তিকেরই দল। 'ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা ভালো'।—'রাশিয়ার চিঠি'র এই মন্তব্য ভুলে না গেলে হেমন্তবালাকে লেখা চিঠিতে তার অনুরণন অস্বীকার করা যায় না।

মোট কথা, সেই সময়ের রবীন্দ্রমানসে এমন কোনো সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না যার সঙ্গে নীতীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির যোগ আছে। ঐ চিঠি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি আকস্মিক। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা ছিল ম্যুনিক থেকে ১২ই জুন নীতীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির জবাব। নীতীন্দ্রনাথ নাৎসীদের উৎপাত, হিটলারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, জার্মানীর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা—সবিস্তারে জানিয়েছিলেন। তাতে দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কবির উদ্বিগ্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন, কেন কবি ফ্যাসিজমের সঙ্গে বল্‌শেভিজমকেও আক্রমণ করলেন, বিশেষত নীতীন্দ্রনাথ যেখানে জার্মান কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কোনো আশঙ্কাজনক সংবাদ দেন নি? অধিকন্তু প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রতি কেন বিদ্বেষ? প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এইজন্যে যে, রাশিয়ার স্মৃতি তখনও অধিকার ক'রে আছে তাঁর মন। মনে পড়ে, এরকম কথা তিনি আগেও একাধিকবার বলেছেন। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' থেকে শুরু ক'রে 'রায়তের কথা' পর্যন্ত মাঝে মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের ও কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে যে বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি। তবে কি রাশিয়া ঘুরে আসবার পরও তাঁর সেই পুরনো ধারণা বদলায় নি? অন্তত তা যে নির্মূল হয় নি এবং প্রচ্ছন্ন ছিল মনের গহনে সে তো স্পষ্ট। নইলে কমিউনিস্টদেরও 'মানুষখেগো দল' বলবেন কেন? নন্দগোপাল সেনগুপ্তের স্মৃতিকথা এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। নন্দগোপাল লিখেছেন—

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.

"মনে হয়েছে, মার্ক্সীয় দর্শনের বস্তুমুখিতা, ধনসাম্যের ভিত্তিতে নূতন বিশ্ববিধান গড়ার জন্যে মার্ক্সপন্থীদের বৈপ্লবিক কর্মনীতি বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক সমানাধিকারাত্মক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে সুস্পষ্ট একটা নেতি ভাব ছিল। এই সব প্রসঙ্গের আলোচনায় এসে তাই তিনি সাধারণত একটু উত্তেজিত হতেন।"[৯১]

তবু কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ অকপট ছিলেন। নীতীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির অল্পকাল পরেই কবিকণ্ঠে সেই প্রশংসা আবার শোনা যায়। কেন তাদের উন্নতি হয়েছে এবং ভারতে কেন তা হচ্ছে না—এই প্রশ্নে তাঁর অভিমত জানতে চেয়ে রাশিয়া থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছিল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় কবির জবাবী টেলিগ্রামটি ছাপা হয়েছিল। কবি জানিয়েছিলেন—

"Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity. Our obstacles are social and political insanity, bigotry and illiteracy."[৯২]

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে কবি পারস্য ভ্রমণে যান। ভিন্ন পরিবেশেও রাশিয়ার স্মৃতি মনে পড়ায় 'পারস্যে' গ্রন্থে লিখেছেন—

"রুশীয় তুর্কিস্থানে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অতি অল্পকালের মধ্যেই এশিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছে তা আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এত দ্রুত বেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে, এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে, সেখানকার সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের, সুতরাং ঈর্ষার বাধা নেই। মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই-সব ছোটো ছোটো জাতিকে আপন আপন রিপাবলিক স্থাপন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। পূর্বেই অন্যত্র বলেছি, বহুজাতিসংকুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক

শাসনে সেটা নিত্যই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয়-সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এশিয়ার নদী-নালার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে।"[৯৩]

এই বিবরণ ও নীতীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি যথার্থই সমান্তরাল। দুইয়ে অত্যন্ত অমিল এবং বিরোধ; দুইয়ের কোনোটিই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় অসংলগ্ন নয়।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে বেরিয়েছিল 'কালান্তর' প্রবন্ধ। ভারতভূমিতে কালের সঞ্চরণ ও কালান্তরের আয়োজনকে কবি ব্যাখ্যা করেছেন এই প্রবন্ধে। সে-ব্যাখ্যায় অত্যাবশ্যকভাবে এসেছে বিশ্বপটভূমিকা। সাম্রাজ্য-বাদী য়ুরোপকে 'বিনিপাত' জানিয়েছেন কবি এবং ঘোষণা করেছেন অপরাজেয় মনুষ্যত্বের উপর তাঁর অপরাজেয় বিশ্বাস। সমাজতন্ত্রের কথা এতে নেই; আর সেই কারণেই আমাদের কাছে এর গুরুত্ব। এইরকম এক মহিমময় প্রবন্ধে—যেখানে কালান্তরের আবাহন করেছেন কবি—সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা সমাজতন্ত্রের অনুল্লেখ আশ্চর্য লাগে; অথচ থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না, বরং অপরিহার্য ছিল মনে হয়।

এই রবীন্দ্রনাথই ১৯৩৫ সালের ৭ই মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন—

"মানুষের যে সভ্যতার রূপ আমাদের সামনে বর্তমান সে সভ্যতা মানুষ-খাদক। তার একদল victim চাই-ই যারা তার খাদ্য, যারা তার বাহন। তার ঐশ্বর্য, তার আরাম, এমন কি তার কাল্‌চার উপরে মাথা তোলে নিম্নতলস্থ মানুষের পিঠের উপর চড়ে। এই নিয়েই য়ুরোপে আজ শ্রেণীগত বিপ্লবের লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে।...

এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের অতিরিক্তের তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে।...

যখন সামনে এতবড়ো দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখন বুঝতে পারি যে

এই দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্‌রো নিয়ে আমরা বাঁচব না।... সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেকদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। আর আজ য়ুরোপের যে সভ্যতার পিঞ্জরে বাঁধা হয়ে আছি আমরা, ঐশ্বর্যভোগের বিষবাষ্প তার তলায় তলায় জমে উঠেছে। সে কি নিরাপদ প্রতাপের কোনো মন্ত্রের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে তার লোহার ক্যাশবাক্‌সের মধ্যে? ...কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন একথা মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহু কালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।"[৯৪]

আশ্চর্য এই চিঠি। এর আবেগে ও আন্তরিকতায়, মননে ও কল্পনায়, সমবেদনায় ও প্রার্থনায় আজকের পাঠকের অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক। ইনি সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি একদা লিখেছিলেন 'রাশিয়ার চিঠি'। সেই আবেগ, সেই শ্রদ্ধা, সেই সমর্থন। রুশ সমাজতন্ত্রের বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর পূর্ণ ঐকমত্য সেদিন যেমন ছিল না তেমনি আজও নেই। তবু, মতপার্থক্য সত্ত্বেও, সেদিনকার মতো এখানেও রবীন্দ্রনাথ নব্যরাশিয়ার মধ্যে

দেখেছেন মানুষের মুক্তি।

বছর খানেক পরে অমিয় চক্রবর্তীর কাছেই একটি চিঠিতে তিনি বৃটিশ ভারতের দুর্দশার কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন তাঁর আশাভঙ্গের কথা। সেই প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন—

"সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধবিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পারি নে। বিশাল রাজ্যের অন্নের সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগ-নিবারণ কী অসাধারণ উদ্যম নৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্বাহ করা হচ্ছে তার বিচার মনে করে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষ্যা না হয়ে থাকতে পারে না। তার প্রধান কারণ সোভিয়েট রাশিয়া একটি অখণ্ড সজীব কলেবর। তার ভিন্ন অংশে বেদনার ও প্রয়োজনের তারতম্য নেই, ছিন্ন হয়ে যায় নি নাড়ী। সেখানে সোভিয়েট য়ুরোপ এবং সোভিয়েট এসিয়ার মাঝখানে কোনো অসম্মান নেই। একদা ইম্পীরিয়ল আমলে সেখানে অখৃষ্টানের প্রতি খৃষ্টানের উপদ্রবে দেশ বারম্বার রক্তে কলুষিত হয়েছে আজ তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। এই শান্তিময় সভ্যতা আনতে সেখানে দুই শতাব্দী লাগে নি। অল্প কয় বৎসর মাত্র শাসনের এই আশ্চর্য ফল। ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতিই শাশ্বত এবং শ্রেয়, আর ধনসাম্যমূলক অর্থনীতি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তার সম্বন্ধে চিন্তা আলোচনা বা গ্রন্থপাঠের স্বাধীনতা পুলিসের দণ্ডাভিঘাতে দমনীয়, শাসনকর্তাদের এই মনোভাব ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক থাক্। সোভিয়েট মত প্রচার উপলক্ষ্যে উক্ত গবর্মেণ্ট জনমতের স্বাধীনতাকে যদি দণ্ড প্রয়োগের দ্বারা দমন করে থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিচার করতে গেলে হাস্যাস্পদ হব।"[৭৫]

বেশ বোঝা যায়, রাশিয়ার অভিজ্ঞতা কবির মনে স্মৃতিমাত্র হয়ে নেই, তা সঞ্চারিত হয়ে গেছে তাঁর চেতনার গভীরেও। দৈশিক কি বৈশ্বিক নানা প্রসঙ্গে নানা সময়ে তাঁর ভাবনায় স্বসমুত্থিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। ইংরেজ শাসকের চোখে যা 'অপরাধবিশেষ' সেই অপরাধ করতে চান নি বলেই কি কবি এ-বিষয়ে প্রকাশ্যে আর কিছু না ব'লে ও

না লিখে নিজেকে মেলে দিয়েছেন ব্যক্তিগত পত্রে ও আলাপে ?[৯৬]

সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা শেষ দিন পর্যন্ত অমলিন ছিল, ছিল গতিশীল। ১৯৩৭ সালে 'ভক্‌স'-এর তদানীন্তন সভাপতি আ. আরোসভ স্বদেশের পক্ষ থেকে কবিকে পুনর্বার রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই কবি তার উত্তরে লেখেন—

"সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ একটুও কমে নি। নতুন রাশিয়াকে আরেকবার দেখার সুযোগ যদি পাই তবে তার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই পাব না—আমার ১৯৩০ সালের ভ্রমণ সত্যই চোখ খুলে দিয়েছে।"[৯৭]

বছর তিনেক পর এক অন্তরঙ্গ আলোচনায় সজনীকান্ত দাসকে রবীন্দ্রনাথ আবেগভরে বলেছিলেন—

"অথচ দেখ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় যাঁরা আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, কত অসুবিধার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। তখন সেখানকার লোকের নৈতিক সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা আমাদের চাইতেও হেয় ছিল। যে দুর্ভাগ্যের স্তরে তারা পোঁছেছিল, আমরা তার কল্পনা করতে পারব না। কিন্তু জননায়করা মিথ্যার কারবার করেন নি বলে সেই ভয়াবহ পঙ্ককুণ্ড থেকে সমগ্র জাতিকে টেনে তুলতে বড় বেশী সময় লাগে নি। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, তখন এই বিপ্লবের বয়স দশ বছরও হয় নি। দেখলাম, দেশের চেহারা বদলে গেছে, সাইবেরিয়ার নরক-স্নান সেরে নতুন স্বর্গ রচনায় তাদের সে কি উৎসাহ! যার যা সম্পদ—মানসিক অথবা দৈহিক, সে তাই খাটাচ্ছে তার পাশের লোককে উন্নত করার কাজে। সর্বনাশা স্বার্থবুদ্ধি তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে নি বলেই রাতারাতি দেশটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে কি বিপুল জাগরণ! এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার—শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজ পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। এই Lateral movement সম্ভব হয়েছিল—যাঁরা এদের নেতৃত্ব করে-

Scanned with CamScanner

ছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের সত্যনিষ্ঠার জোরে।"[৯৮]

দেখা যাচ্ছে—যে বিস্ময়, আবেগ ও শ্রদ্ধা থেকে কবি একদা 'রাশিয়ার চিঠি' লিখেছিলেন, দশ বছরে তা এতটুকু মলিন হয় নি, কোনো উত্তর-চিন্তাই ধূসর ক'রে তোলে নি তাকে।

ঠিক কথা। কিন্তু সমাজতন্ত্র বিষয়ে আলাদা ক'রে ভাবা ও লেখা, যৎকিঞ্চিৎ হলেও যেমন বার কয়েক ঘটেছে অনেক আগে, রাশিয়া ঘুরে আসবার পর তেমন কিছু তাঁর কাছ থেকে মেলে নি। রাশিয়ার কথা তিনি অনেক বলেছেন, বলেছেন অনিরুদ্ধ আবেগেই, তবু, সমাজতন্ত্র বিষয়ে কিছু রচনাও হয়তো প্রত্যাশিত ছিল—বিশেষত রাশিয়ার অভিঘাত যখন লঘু ছিল না তাঁর চেতনায়। অবশ্য এ আক্ষেপ অর্থহীন, অনুচিতও।

বহুমাত্রিক হলেও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রধান মাত্রা যে শিল্প—এ-বিষয়ে কোনো তর্ক নেই। আপন সৃষ্টিতে শিল্পীর যে আত্মপ্রকাশ ঘটে তার সত্যতা কোনো নথিপত্রের থেকে কম নয়। যে কথা প্রাণ খুলে বললে বিপদ হতে পারে, সে কথা তো শিল্পীরা হামেশাই বলে থাকেন শিল্পের ভাষায়। চিঠিপত্রের বাইরে রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের কথা প্রায় বলেন নি। কিন্তু বিরল হলেও গুরুত্বহীন নয় সেই সৃষ্টি যেখানে তাঁর কল্পনা ও কলমকে অধিকার করেছে সমাজতন্ত্র। আলোচ্য সময়ে একটি কবিতায় অভাবিত-ভাবে এসেছে সমাজতন্ত্র—সরাসরি না হলেও সগৌরবে, প্রেয় ও শ্রেয় রূপে।

১৯৩৬ সালের ৩রা জুলাই কবি 'অমৃত' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি আছে 'শ্যামলী' কাব্যে। তাতে আছে একটি গল্প। নায়িকার নাম অমিয়া, ধনীর কন্যা। সে প্রথমে ভালোবেসেছিল যাকে কবিতার 'আমি' সেই। অর্থগৌরব ছিল না তার। তাই প্রেয়সীকে গ্রহণ করবার আগে সে অর্থগৌরবে তার যোগ্য হয়ে উঠতে চাইল। সেই অবসরে অমিয়ার জীবনে এল নতুন নায়ক। তার নাম মহীভূষণ, জনৈক রায়বাহাদুরের বিলেতফেরত একমাত্র ছেলে। বিষয়কর্মে তার ভয়ানক অনাসক্তি; 'ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষ্মীখেদানো বাদুড়টা'।

Scanned with CamScanner

অমিয়া মহীভূষণকে গ্রহণ করে, সেই সঙ্গে তার আদর্শকেও। অর্থগৌরব, সুখ ও নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে সে এক গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয়ে নিজেকে সঁপে দেয়, বাসা বাঁধে সেখানেই। কেন ?—

"অমিয়ার শেষ কথা এই,
'এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার'।
আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'
অমিয়া বললে, জেলখানায়।"

এই কবিতার প্রথমে আছে উপনিষদের মৈত্রেয়ীর পরম প্রার্থনা। শেষে একালের মৈত্রেয়ীর পরম জ্ঞান ও প্রাপ্তি। সেই পূর্ণতায় পৌঁছনোর বৃত্তান্তকে রবীন্দ্রনাথ স্তরে স্তরে বর্ণনা করেছেন। নাম দিয়েছেন 'অমৃত'। কি সেই অমৃত ? অমিয়ার প্রেম। সে প্রেম ব্যক্তিতে সম্পূর্ণ নয়, ব্যক্তি-পাত্রকে অবলম্বন ক'রে এক মহান আদর্শে আত্মসমর্পিত ব'লে সম্পূর্ণ ও মহিমান্বিত। ধনমোহ ও আত্মসর্বস্বতা থেকে মুক্তি আছে সেই আদর্শে। কবির মতে, একালের অমৃততত্ত্ব সেটা।

যুগধর্মের প্রভাব সত্যিই বোধ হয় অপ্রতিরোধ্য—অন্তত তাঁর পক্ষে তো বটেই যিনি পরিবর্তনশীল সময় সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন, যিনি সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য খোঁজেন, আর সে-উদ্দেশ্যে নিরন্তর নির্মাণ করেন নিজেকে। তাই নিরতিশয় উদারনীতিককে বলতে হয় শ্রেণীসংগ্রামের কথা—যদিও তিনি বলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। মৃত্যুর মাত্র মাস পাঁচেক আগে রচিত হয় 'গল্পসল্প'—১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে। লঘু ভঙ্গিতে, পরিহাসের হাল্‌কা হাওয়ায় বলা হয়েছে গল্পগুলি। ভঙ্গিটা নির্ভার হলেও সমস্ত কথাই কিন্তু লঘু নয়, এবং 'বড়ো খবর' গল্পটি তো রীতিমতো গুরুভার। সেই গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার করা প্রয়োজন।—

"শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্‌ঠক্ করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো

আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নিচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটোলোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী করে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় কটাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা বলে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়্‌ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবক্‌সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইৎরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি কষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপ্‌ঝপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে

Scanned with CamScanner

পালের গুমর। ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকো—ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক।"

কত সহজে রূপকের মধ্য দিয়ে কবি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটি জ্ঞাপন করেছেন! ঐ তত্ত্ব শুধু তত্ত্ব নয়, প্রবল বাস্তবতাও। তাই তাকে বলেছেন খবর এবং যেমন-তেমন খবর নয়, আজকের দিনের সব থেকে বড়ো খবর। এক বালিকাকে উপলক্ষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ যে খবরটি দিয়েছেন তা যেহেতু বাল্যভোগ নয়, সেহেতু মনে হয় না কি, খবরটি তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না? একে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন কিনা সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু বিষয়টি যে তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভাবনাটা তাঁকে বোধ হয় অন্য এক মৌলিক প্রশ্নেরও সম্মুখীন করেছিল। নইলে কেন এই জবাবদিহি?—

"কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয়? তুমি ঠাট্টা করছ। দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে। তখন?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।"

এ কি নেহাতই গল্প, না গল্পকারের তির্যক আত্মপ্রকাশও? এ কি নিছক ঘোষণা, না কঠিন সত্যের কাছে বিনম্র আত্মসমর্পণও?

অন্যদিকে যে সোভিয়েত রাশিয়া কবিকে নূতন চেতনাগঙ্গার সন্ধান দিয়েছিল—ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পাপ থেকে যে পতিতপাবনী মানুষকে উদ্ধার করবে ব'লে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেই রাশিয়া যখন ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করল তখন মর্মান্তিক আঘাত পেলেন তিনি। রাশিয়ার পক্ষে যে যুক্তিই থাক, কবির কাছে ঐ আক্রমণ আক্রমণ বলেই নিন্দনীয়। সেটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় মনে হত, রবীন্দ্রনাথ স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঐ আঘাতে তিনি প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'অলকা' পত্রিকায় ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তার কয়েক মাস পরে লেখেন 'অপঘাত' কবিতা। এমনকি,

একটি গল্পের বইয়ের সমালোচনাতেও সেই আঘাতজনিত ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে অসংলগ্নভাবে।[৯৯] সুতরাং বোঝা যায়, কবি কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তা ব'লে এমন ভেবে নেওয়া সংগত নয় যে, ঐ আঘাতে সোভিয়েত রাশিয়ার উপর তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি অবধারিতভাবে স্খলিত হয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের স্বর্গ থেকে। কবিতাটি খুঁটিয়ে দেখলে কি পাই? ঘটনার সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল কবির কাছে, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে কবিতায়। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে আছে ঐ সংবাদ; তার আগে আটাশটি পঙ্‌ক্তিতে বর্ণিত হয়েছে জীবনের ভরা আনন্দ। দুই অংশের সুস্পষ্ট অসংলগ্নতায়, ভাবগত বৈপরীত্যে একান্তভাবে যা প্রতীয়মান তা হল ঘটনাটির প্রবল অভিঘাত এবং সহজ জীবনানন্দের 'অপঘাত'। এর অতিরিক্তি কোনো বাণী কি ব্যঞ্জনা এখানে নেই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, সরকারী আমন্ত্রণে ও আতিথ্যে তীর্থ দর্শন করলেও রবীন্দ্রনাথ তীর্থের পাণ্ডা অথবা পুরোহিতের কাছে আত্মবিক্রয় করেন নি।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল অনেক দিন, মানবমুক্তির নূতন দিগন্তকে তিনি দেখেছিলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে। তাঁর ঐ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অবিচল ও অম্লান ছিল। এবিষয়ে যাবতীয় ভ্রান্তিবিলাসের মূলোচ্ছেদ ক'রে দেয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সাক্ষ্য। প্রশান্তচন্দ্র জানিয়েছেন—

"রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও বারেবারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারেবারে বলেছেন, সব চেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ-ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা: "রাশিয়ার খবর বলো।"

বললুম, "একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।" মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।"

তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য, যে, তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।"[১০০]

উল্লেখপঞ্জী

১. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৩৭২

২. A History of Socialist Thought (2)—G. D. H. Cole. Chapter XIV

৩. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৪৩৪

৪. 'সাধনা' মাঘ ১২৯৮

৫. 'সাধনা', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

৬. A History of Socialist Thought (2) P. 440-462

৭. শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। পৃ. ৩৩৮-৪২

৮. ছিন্নপত্রাবলী—রচনাবলী (১১)। পৃ. ১০৭

৯. রবীন্দ্রজীবনী (২)—১৯৬১। পৃ. ৫০৬, পাদটীকা।

১০. রচনাবলী (১০)—পৃ. ৬৭৯

১১. রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা—চিন্মোহন সেহানবীশ। পৃ. ৬৯-৭০

১২. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ৪২০

১৩. রবীন্দ্রনাথ—এণ্ডরুজ পত্রাবলী। পৃ. ৭৬

১৪. 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'—রচনাবলী (১৩)। পৃ. ১০

১৫. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ৩৪৩

১৬. তদেব। পৃ. ৩৪৭

১৭. খসড়াটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রচিন্তা-চর্চা—ভবতোষ দত্ত। পৃ. ১৫৫।

১৮. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ৩৫০
১৯. তদেব পৃ. ৩৪৭
২০. ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৩—শঙ্খ ঘোষ। পৃ. ২৫
২১. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ৩৪৫-৪৬
২২. ভারতবর্ষ—রম্যাঁ রলাঁ। অনু: অবন্তী সান্যাল। পৃ. ৯৪
২৩. রচনাবলী (১৩)। পৃ. ৩৪৪
২৪. তদেব। পৃ. ৩৪৬
২৫. তদেব।
২৬. পিতৃস্মৃতি, ১৩৭৮। পৃ. ২১৬
২৭. কবির সঙ্গে য়ূরোপে, ১৩৭৭। পৃ. ১৭৫
২৮. ভারতবর্ষ। পৃ. ১৭৮-৭৯
২৯. কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট কোয়ালিশন ব্যর্থ হলে ১৯১৯-এ হাঙ্গেরীর কর্তৃত্ব দখল করেন এ্যাডমিরাল হর্টি; তারপর নির্মমভাবে চূর্ণ করেন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের
৩০. কবির সঙ্গে য়ূরোপে। পৃ. ২৩২
৩১. Rabindranath Tagore in Hungary—Gyula Wojtilla, 1983, P. 14
৩২. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর—সংকলন ও সম্পাদনা: শৈলেন চৌধুরী। পৃ. ৬
৩৩. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৭২৫
৩৪. সোভিয়েত প্রকাশনা থেকে জানা যায় যে, সেদেশের বিজ্ঞান আকাদেমির দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী' ও বিশ্বভারতীর অন্য প্রকাশনায় এর কোনো উল্লেখ নেই।
৩৫. রবীন্দ্রজীবনী (৩), ১৯৬১। পৃ. ৩৮০-৮১
৩৬. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৬৮০-৮১
৩৭. Letters from Russia, Appendix VI, 1984, P. 170-71
৩৮. তদেব। পৃ. ১৭৩
৩৯. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর। পৃ. ৪৫-৪৬
৪০. অপ্রকাশিত রচনা। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

Scanned with CamScanner

৪১. রচনাবলী (১০)। পৃ. ১৭৯

৪২. তদেব। পৃ. ৭০৪

৪৩. Letters from Russia, P. 161-62

৪৪. তদেব। পৃ. ১৬৩

৪৫. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৬৮৫-৮৬

৪৬. 'রাশিয়ার চিঠিতে সেদেশের নূতন সাহিত্য-শিল্পের কোনো সংবাদ না থাকায় শ্রীশঙ্খ ঘোষ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'নির্মাণ ও সৃষ্টি' গ্রন্থে। ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর আক্ষেপ হতেই পারে ; তবে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন মানসিকতার কোনো যোগ আছে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মন তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। যেমন—ভারতের দুর্দশা, বিশ্বভারতী, জমিদারী, সর্বোপরি নতুন সমাজব্যবস্থা।

৪৭. অধ্যাপক পেত্রভকে স্পষ্টই বলেছিলেন, "ভারতীয় জনসাধারণকে আপনাদের সাফল্যের কথা জানানোর জন্য আমি কিছু করতে চাই।" রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়কে লেখা ৪ঠা অক্টোবরের চিঠিতে এই কথাগুলিও (গ্রন্থে বর্জিত) ছিল —"বিস্তারিত বিবরণ লেখার সময় নেই। অন্যদের যে সব চিঠি লিখেছি সেই সমস্ত সংগ্রহ ক'রে নিলে অনেক কথা জানতে পারবেন। এ সমস্ত সংবাদ দেশের সবাইকে জানানো চাই। অতএব ইংরেজিতে তর্জমা করে মডার্ন রিভিয়্যুতে ছাপাবেন।" শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

৪৮. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৭০৪-৫

৪৯. তদেব। পৃ. ৬৮৬

৫০. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর। পৃ. ৫৩-৫৪

৫১. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৬৭৫। তুলনীয় :—১০.১১.১৯২৭ তারিখে মস্কো থেকে জওহরলাল বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে লিখেছিলেন—

"We are in topsy turvey land. All one's old values get upset and life wears a strange aspect here."—

—Selected works (2), P-369

৫২. তদেব। পৃ. ৬৮৬। তুলনীয়—"What was obvious however was the extraordinary absence of different classes such as we find in other countries. There was very little to separate the

President of Soviet Union from the poorest peasant, and the later is as ignorant and primitive as the Indian peasant." এবং "There can be no doubt that the conditions of the peasantry and the workers in Russia, in spite of the general poverty and low wages, are far superior to those elsewhere. What is more, their whole moral stature has improved and they look forward with hope and confidence to the future."

—বিজয়লক্ষ্মীকে নেহেরুর পত্র। তদেব। পৃ. ৩৭২।' Sovivet Russia গ্রন্থে নেহেরু লিখেছেন—"But the real change one notices in Moscow, and which grows on one with every day's stay, is in the atmosphere and the very air of place. The contrasts between extreme luxury and poverty are not visible, nor does one notice the hierarchy of class or caste." (তদেব। পৃ. ৩৮৮)

৫৩. তদেব। পৃ. ৭০৪

৫৪. তদেব। পৃ. ৭১৬

৫৫. তদেব। পৃ. ৬৯৯

৫৬. তদেব। পৃ. ৬৭৮। তুলনীয়—বিজয়লক্ষ্মীকে লেখা পত্রে নেহরুর মন্তব্য—

"Moscow in some ways like any big city, and yet it is so different. The comparative poverty of the people is obvious ...But the spirit of equality is rampant, and pride in the revolution." তদেব। পৃ. ৩৬১

৫৭. তদেব। পৃ. ৬৯৩

৫৮. তদেব। পৃ. ৬৭৬। তুলনীয় নেহেরুর মন্তব্য—"The new Russia is a fascinating study from many points of view. But to an India the most interesting and instructive aspect of her new policy is probably her attitude to education and specially her gallant fight against illiteracy.—তদেব। পৃ. ৪২৭

৫৯. তদেব। পৃ. ৭০০। তুলনীয় নেহেরুর মন্তব্য—"A third feature of Soviet education, which necessarily follows from the principle of communism, is its organisation for the masses. In vast countries the better type of education is a monopoly of the well-to-do in private schools. In Russia an attempt is made to give this education to all. And it is based on the principle that education must be collective or co-operative, that is, the

goal is not merely the acqusition of knowledge and individual skill but the ability to give to others and to take from them." (তদেব। পৃ. ৪২৯)

৬০. তদেব। পৃ. ৭০৭

৬১. তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর। পৃ. ৫১-৫২

৬২. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৬৯৪। তুলনীয় নেহেরুর মন্তব্য—

"A second outstanding feature of Russian education is the relation which exists between the school and the everyday world. Education is not something in the air, but off from the daily life of the student or from his future work as a citizen. Real education, it is felt, must based on the actual environment and experiences of the child and it must fit him for the work he will have to do in after-life." (তদেব। পৃ. ৪২৮)

৬৩. তদেব। পৃ. ৭০৬

৬৪. তদেব। পৃ. ৭০৭

৬৫. Letters from Russia. P. 209-10

৬৬. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৬৯২

৬৭. তদেব। পৃ. ৬৯৩

৬৮. তদেব। পৃ. ৬৮৯

৬৯. তদেব। পৃ. ৬৯১

৭০. "Whatever other failings the Russian woman of today may have, she is certainly not a chattel or plaything of man. She is independent, aggressively so, and refuses to play second fiddle to man." এবং "Woman occupy the highest positions in the Soviet Union."

—Selected Works (2), P. 440 and 442

৭১. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৭১৭

৭২. তদেব। পৃ. ৭১০

৭৩. তদেব। পৃ. ৬৯২। তুলনীয় নেহেরুর মন্তব্য—"It is difficult to draw any final conclusions about anything Russian at this stage, but it would certainly appear from the progress made in the

last five years that the problem of minorities has been largely solved there. This does not mean that complete equality has been established and there no evils left." (পূর্বোক্ত বই : পৃ. ৪২৬)

৭৪. তদেব। পৃ. ৬৮৭

৭৫. তদেব। পৃ. ৭০২

৭৬. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর পৃ. ৮০-৮২

৭৭. তদেব। পৃ. ৮৭

৭৮. এ-প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক নেহেরুর কথা। নেহেরু মাত্র তিন দিন মস্কোয় ছিলেন এবং তাও রবীন্দ্রনাথের রুশদর্শনের তিন বছর আগে। ঐ তিন দিনের অভিজ্ঞতা থেকে নেহেরু বিজয়লক্ষ্মীকে লিখেছিলেন—"Impressions crowd on me but I cannot go on. The picture I carry away from Russia is one of admiration for the men who have accomplished so much within a few years in spite of all the disadvantages that one can imagine."

—Selected Works (2), P. 374, 'Soviet Russia'.

নামে বইতে নেহেরু জানিয়েছেন—"...I must confess that the impressions I carried back with me from Moscow were very favourable and all my reading has confirmed these impressions, although there is much that I do not understand and much that I do not like or admire." (তদেব। পৃ. ৩৯৯)

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ—চিন্মোহন সেহানবীশ। পৃ. ৬৫

৮০. Letters from Russia, P. 214-216

৮১. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৭৩০

৮২. চিঠিপত্র (৫)। পৃ. ৮২

৮৩. Modern Review—Editor's Notes, Dec. 1930.

৮৪. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৭১৯

৮৫. তদেব। পৃ. ৭০৭

৮৬. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ—অনুঃ শুভময় ঘোষ। পৃ. ১৬৩

৮৭. তদেব। পৃ. ১৭১

৮৮. অধ্যাপক পেত্রভকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমেরিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে একটি বই পড়ি—একজন আমেরিকান

মহিলার লেখা।...বইটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে।...এই বইটি আমায় অনুপ্রাণিত করে। দেখতে পাই, আপনাদের দেশে যা করা হচ্ছে তার সঙ্গে আমার জীবনের স্বপ্নের অনেক মিল রয়েছে। হয়ত আরো অনেক বই আছে, তাতে আপনাদের গঠনকাজের নানা দিকের কথা বলা হয়েছে—অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশ। সে সব বই পেতে আমি খুবই উৎসুক, যদি পাওয়া যায় তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।"—
'তীর্থদর্শন' এর পঞ্চাশ বছর। পৃ. ৫৬

৮৯. চিঠিপত্র (৪)। পত্র সংখ্যা ৫

৯০. চিঠিপত্র (৯)। পত্র সংখ্যা ২১

৯১. কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮। পৃ. ৪৫

৯২. রবীন্দ্রজীবনী (৩), ১৯৬১। পৃ. ৪১৭

৯৩. রচনাবলী (১০)। পৃ. ৭৬১

৯৪. চিঠিপত্র (১১)। পত্র সংখ্যা ৭৪

৯৫. চিঠিপত্র (১১)। পত্র সংখ্যা ৮৯

৯৬. দেশে ফিরে এসে রাশিয়া সম্বন্ধে 'ভালো করে' কিছু লেখবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল। রাশিয়া থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর প্রতিমা দেবীকে তিনি যে চিঠি দেন তা থেকে এই সংবাদ জানা যাচ্ছে। তাতে লেখেন—"এ দেশে অনেক জিনিস দেখবার অনেক কথা ভাববার আছে। ভালো করে সব লিখব মনে করছি। দেশে ফেরবার আগে হয়ে উঠবে না।" এই চিঠি 'রাশিয়ার চিঠি' বইতে নেই। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত। এ বিষয়ে শ্রীচৌধুরীর আকর প্রবন্ধ 'রাশিয়ার অন্য চিঠি' ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি তাঁর 'ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সূত্রে আরো জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে হেমবালা সেনকে লিখেছিলেন—"রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে দেখো।"

৯৭. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ। পৃ. ১৬৩

৯৮. রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, ১৩৬৭। পৃ. ৩০-৩১
সজনীকান্ত জানিয়েছেন—'রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অংশ তিনি স্বয়ং দেখিয়া দিয়া এই প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশের অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৩৪৭ সনের বৈশাখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।"

৯৯. রবীন্দ্রজীবনী (৪), ১৩৬৩। পৃ. ১৮৬

১০০. 'কবি-কথা'—বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

যিনি শান্তিবাদী ও অহিংসাবাদী, প্রীতি ও শিক্ষার দ্বারা মানুষের মন-বদলকেই যিনি সমাজ-বদলের মোক্ষম উপায় ব'লে বিশ্বাস করেন এবং যাঁর সেই বিশ্বাস দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা সহ্য করেও অক্ষয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর সখ্য ও চিন্তার সাযুজ্য আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু যেহেতু তাঁর কোনোপ্রকার বিশ্বাসের গোঁড়ামি ছিল না, যেহেতু তাঁর সহিষ্ণুতা ও গ্রহিষ্ণুতা ছিল অসাধারণ এবং যেহেতু তিনি ধনতন্ত্রকে মানুষের বৃহত্তম বিপদ ব'লে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই, অসম্ভবকেও কতকাংশে সম্ভব হতে দেখি। তাঁর দীর্ঘকাল-লালিত ও আঘাতসহ বিশ্বাসের কোনো কিছুই তিনি বিসর্জন দেন নি; নিজের মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি গ্রহণ করেছেন সমাজতন্ত্রের ততটুকু—যতটুকু তাঁর পক্ষে গ্রহণযোগ্য, যা গ্রহণযোগ্য নয় তারও কোনো কোনো অংশে অব্যবহিত প্রত্যাখ্যানের থেকে প্রত্যাশা-পূর্ণ অপেক্ষাকে তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। দেয়ালের লিখন পড়তে তিনি ভুল করেন নি, সে-লিখন তাঁর মর্মগত বিশ্বাসের অনুরূপ না হলেও যেহেতু লিখন—তাই অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন নি। বরং অভ্যস্ত উদারতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে সে-লিখনের অস্ত্যর্থক ও নঙর্থক উভয় দিক সম্বন্ধেই সচেতন ক'রে দিয়েছেন আমাদের।

মানুষ যেখানে সবার উপরে সত্য, মানবমহিমা যেখানে কবিবচন নয়—উল্লাসজনক বাস্তবতা, সেই সোভিয়েত দেশকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এ-জন্মের তীর্থ। তীর্থ শব্দের অর্থ—পুণ্যভূমি, দেবস্থান, পাপমোচনের ক্ষেত্র। বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ কোন্ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন? বোধ হয় সর্ববিধ অর্থেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যই যে সোভিয়েত দেশ তাঁর কাছে পুণ্যভূমি—এ তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। বলেছেন—

"শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম

Scanned with CamScanner

না ; কেননা, নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।...

এই-যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কত দিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে—সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকারসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্ব-ব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিকবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"[১] বিপ্লবের ঐ পুণ্যভূমি কবির চোখে যেন এক অভিনব দেবস্থান। কল্পিত দেবতার আসনে এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছে জীবন্ত মানুষ, নিখিল মানবতা।—

"অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে

আছে ?"[২] ক্ষুব্ধ হয়ে এই প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ নিছক প্রশ্ন নয়, বদ্ধমূল সংস্কারকে প্রত্যাখ্যানও। আবেগের তীব্রতায় ও প্রবলতায় সেই প্রত্যাখ্যান তির্যক হয়ে গিয়ে প্রশ্নের আকার নিয়েছে।[৩] অন্য এক চিঠিতে ঐ আবেগেই মন্তব্য করেছেন, "ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা ভালো।" রাশিয়া থেকে আমেরিকায় গিয়ে বলেছেন, "Service of mankind might be their religion."

সোভিয়েত রাশিয়ায় নাস্তিকের দল নরদেবতার পূজায় মেতেছে। তাদের পূজাপদ্ধতির নাম সমাজতন্ত্র। পূজা ও পূজ্যই কবির কাছে আসল; পূজারীর উপবীত আছে কি নেই, তার আচার ও মন্ত্র সনাতন শাস্ত্রসম্মত কিনা—এই সব নিয়ে কবি মাথা ঘামান নি। ঐ দেবস্থানে তিনি দেখেছেন বুর্জোয়া সভ্যতার, তাঁর ভাষায় পরশ্রমজীবী সভ্যতার, পাপ-মোচনের মহান ব্রতের উদ্বোধন। সে-দেখা যত আংশিক ও পরনির্ভর হোক না কেন, কবির সিদ্ধান্তে কোনো কূটনৈতিক কপটতা ছিল না। "প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হতে পারে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষ-সম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়—মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে"।[৪] এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রকে দেখেছেন, এবং যতটুকু দেখেছেন তাইতেই তাঁর মনে হয়েছে, সমাজতন্ত্র হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাপমোচনের মহান ব্রত; আর সোভিয়েত দেশ ঐ ব্রত মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে ব'লে কবির কাছে তীর্থ। সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত যথার্থ না ভ্রান্ত—এ-বিচার বাদ দিয়েও যা থাকে তা হল সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এবং আমাদের আগ্রহ সেখানেই। সমাজতন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নির্ধনের শক্তি-সাধনা', এই সাধনায় তিনি দেখেছেন 'ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব', মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য ঘুচে যায় এর দ্বারা, ফলে

মানুষ পায় সেই মূল্য ও মর্যাদা যা অভূতপূর্ব।

সমাজতন্ত্রের এই অন্তঃসার উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করেছেন, দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। কবির রুশভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী অমিয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন—

"ভারতে কবে এইভাবে সার্বিক শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, মেয়েদের স্বাধীনতা গ্রামে শহরে দেখা দেবে সেই কথাই কবি বারে বারে আমাদের বলতেন।"[৫]

এই আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনা, ঐ উপলব্ধি ও সমর্থন, রুশভ্রমণের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ামাত্র ছিল না—তাঁর চৈতন্যের গভীরেও চারিয়ে গিয়েছিল। সেটা বোঝা যায় যখন দেখি, জীবনের শেষ দশকে তাঁর সমাজচিন্তায় এক নতুন মাত্রা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। একদা তাঁর চিত্তলোকে যাকে প্রক্ষিপ্ত মনে হত ক্রমে তার গহন সঞ্চরণ জাগিয়ে তুলেছে বিরোধ ও সমান্তরলতা। বিপ্লব ও 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্' রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের অনুকূল নয়। শ্রেণীবিভক্ত পৃথিবীতেও মানুষে মানুষে মিলন, ঐক্য ও এক সমন্বয়ী সমাজতত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যখন অভিজ্ঞতা ও যুক্তি ঐ বিশ্বাসের প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তখনও তিনি তাঁর মর্মগত বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন নি। কিন্তু ঐ বিশ্বাস যদি প্রবল প্রতিবাদীর সম্মুখীন না হত, যদি সমান্তরালভাবে জেগে না উঠত অন্য এক বিশ্বাস ও প্রয়োগসিদ্ধ প্রকল্পের দাবি, তবে ব্যর্থ হত তাঁর তীর্থদর্শন। রুশ বিপ্লবের বাণী যে বিশ্ব-বাণী এই সত্যকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। "সত্য যে কঠিন, / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা।"—এ যাঁর কথা সেই রবীন্দ্রনাথই কঠিন সমাজসত্যকে নিঃসংশয়ে অঙ্গীকার ক'রে গভীর মর্মবেদনায় পুত্রকে লিখেছেন—

"যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেক কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমি-দারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার

গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপ-জীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।”[৬]

একই আবেগে পুত্রবধূকে জানিয়েছেন—

“এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোশাক আমাদের ছাড়তে হবে নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য বিধান এই যে, এখন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে পারব।”[৭]

দুটি চিঠিই রুশদর্শনের অব্যবহিত ফল। যে বেদনা, বাসনা ও লজ্জা ছিল মনের গভীরে, ১৯৩০-এ রাশিয়ায় গিয়ে তা অবারিত হয়েছে। তার দশ বছর পর বালিকা পৌত্রীকে গল্পচ্ছলে শুনিয়েছেন ‘বড়ো খবর’—শ্রেণী-সংগ্রাম। মেহনতী মানুষের সঙ্গে তাল মেলাবার সংকল্প জানিয়েছেন নির্দ্বিধায়। এই সংকল্প যে অসংলগ্ন ও তাৎক্ষণিক জবাবদিহি মাত্র ছিল না সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটার অন্য অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।—

“জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো—তাতে দুঃখের ভার কমে যায়, বৃথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—এখনি পাচ্ছি, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয়, যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আলগা করে দিই—টানাটানি করতে গেলেই বাঁধন হয়ে ওঠে ফাঁসি।”

যখন দেখি দশ বছর পরেও কবিচিত্ত এই ভাবনায় তৎপর, তখন মনে হয় ‘বড়ো খবর’ গল্পে নাতনীকে যেকথা বলেছিলেন সে শুধু কথার কথা নয়; মনে হয়, মানব-ইতিহাসের অমোঘ ভবিতব্যের উপলব্ধি তাঁর চিন্তায় একটি নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

মস্কোয় ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে যে সভা হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"আমি স্বপ্ন দেখি সেই দিনটির যেদিন আর্যসভ্যতার ঐ প্রাচীন ভূমির সব মানুষ শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ লাভ করবে। আমার বহু দিনের স্বপ্ন, যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তির স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে আমায় যাঁরা সাহায্য করলেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"[৮]

'শিক্ষা ও সাম্যের মহাশীর্বাদ' ও 'যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত গণমানসমুক্তি'—রবীন্দ্রনাথের এই বহুকালের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে সমাজতন্ত্র। এজন্য সমাজতন্ত্রে তাঁর সমর্থন। সেই সমর্থন থেকে জন্ম নিয়েছে আর একটি স্বপ্ন —যাতে ভাবী সমাজতান্ত্রিক ভারতের মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সে-মুখচ্ছবিকে সমাজতান্ত্রিক বলবার পক্ষে যুক্তি কি ? যুক্তি একটাই এবং তা এই যে, অন্য কোনো তন্ত্রে ঐ সাম্য ও মুক্তি সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু, ঐ সাম্য ও মুক্তির যে বাস্তব রূপকে চাক্ষুষ ক'রে কবির স্বপ্ন মঞ্জুরিত হয়েছে, কৃতজ্ঞতায় বিনত হয়েছে তাঁর চিত্ত, তার নাম তো সমাজতন্ত্রই। অতএব সংশয় অথবা দ্বিধার অবকাশ কই ?

"সোসিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর ; মানুষ ভারী হতভাগ্য।"[৯]—এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম জেগেছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। অর্থনীতির চিন্তা তাঁর স্বধর্ম নয়। সেদিক থেকে সমাজতন্ত্রকে বোঝাবার আগ্রহ স্বভাবতই তাঁর মনে জাগে নি—এমন কি রুশভ্রমণের পরেও না। আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ সম্ভব কিনা, এ-প্রশ্নে তিনি সংশয়ী ছিলেন। তবু সব সংশয় ও নৈরাশ্যকে প্লাবিত ক'রে মানুষের দুঃখ তাঁকে অভিভূত করে এবং তীর্থে গিয়ে তিনি পেয়ে যান নতুন আলো—সংশয়ের মেঘাবরণ ছিন্ন ক'রে অভিনব চেতনার অরুণোদয় যেন। অন্তর্গূঢ় ভাবনার বর্ণনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মনে করেছিলুম, সমাজের একটি চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে

কোনো কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্য উঠেপড়ে লাগা উচিত।"[১০]

আমরা জানি, সত্যি সত্যি তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু লোক-সেবার মধ্যেও তো ভেদজ্ঞান প্রচ্ছন্ন। সেবার প্রশ্ন অবান্তর যদি না দুঃখী থাকে। সেবা যে করে আর সেবা যে নেয়—এই দুইয়ের ব্যবধান তো সেবার দ্বারা দূর হয় না। কাজেই সেবা নয়, চাই সর্বমানবে সাম্য। চাই সেই সমাজ যেখানে কেউ থাকবে না দুস্থ—অতএব সেবকও থাকবে না কেউ। এইরকম ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছে তাঁর চিত্ত। সেই আন্দোলন, ভাবনার সেই অন্তঃস্রোত বর্ণনা ক'রে কবি লিখেছেন—

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলেরই পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপর-ওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করবার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য

Scanned with CamScanner

সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে, এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।"[১১]

১৮৯৩ থেকে ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই ছিল কবির চিন্তা-ধারা। প্রায় চল্লিশ বছরে যে চিন্তা কোনো কূল খুঁজে পায় নি, সমাজ-তান্ত্রিক রাশিয়ায় সে যেন এক উত্তরণযোগ্য ডাঙা খুঁজে পেল। ডাঙা তো নয়, পেল এক নির্মীয়মাণ কিন্তু প্রাণময় নতুন পৃথিবী—অসম্ভব তার সাহস, অশেষ তার উদ্যম, অজস্র তার সম্ভাবনা। দেখে তাঁর মনে হল—

"যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ার একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা-সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।"[১২]

অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে কবি শুধু আশ্চর্যই হন নি, উদ্বোধিতও হয়েছেন। একদা যে নিরুপায়বোধ তাঁর মন জুড়ে ছিল তাকে সরিয়ে দিয়ে জেগে উঠেছে নূতন প্রত্যয়।

তাই লিখেছেন—

"দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে

Scanned with CamScanner

উঠেছে।"[১৩]

"—আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মানুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ, শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে; এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে। নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।"[১৪] মানুষের পরিত্রাণের যে উপায় রবীন্দ্রনাথ এখানে নির্দেশ করেছেন তা তাঁর পক্ষে অভিনব। বক্তব্যকে যে বস্তুভিত্তির উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাই থেকে যে অনিবার্য ও অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তে তথা মীমাংসায় পৌঁছেছেন তার সঙ্গে মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের চিন্তার সংহতি চোখে পড়া অসম্ভব নয়। সমাজবিজ্ঞানী আর কবির ভাষার পার্থক্য তো স্বাভাবিক; কিন্তু সেই ভাষা বহন করছে যে বক্তব্য তাতে শ্রেণীবিভক্ত এই পৃথিবীর ছবিটা এতটুকু অস্পষ্ট হয়ে যায় নি, অস্পষ্ট থাকে নি মুক্তির উপায়ও। তীর্থের মাহাত্ম্য তাই অব্যবহিতভাবে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।—

"যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব।···কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই—সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের সত্ব বলে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে। উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না? যেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলেছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে; সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো। মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং। কারো ধনে লোভ কোরো না।

Scanned with CamScanner

কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

য়ুরোপে অন্য-সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠেছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে, অধিকাংশ পাচ্ছে না—এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য ; বলেছিল মানব প্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে, মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য ; ভাগটাই মায়া—সম্যক্ চিন্তা সম্যক্ চেষ্টা দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে।”[১৫]

রবীন্দ্রনাথ সাম্য নিয়ে আগে কখনো এভাবে ভাবেন নি। এ বিষয়ে গূঢ়ৈষণা থাকলেও তাঁর লোকহিতব্রতের কেন্দ্রে ছিল না সাম্য। মানুষে মানুষে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যে তিনি দুঃখ বোধ করেছেন, সেই বোধ তাঁকে নান্দনিক আনন্দলোক থেকে অহরহ নিক্ষেপ করেছে কর্মময় বৃহৎ সংসারে, প্রবল সংবেদনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন নানা লোক-হিতকর কর্মে। কিন্তু পল্লীসংগঠন, কৃষি-উন্নয়ন, সমবায়—তাঁর এইসব গৌরবমণ্ডিত কর্মকাণ্ডে সাম্যের আদর্শকে তিনি লক্ষ্য ক'রে তোলেন নি।[১৬]

এল্‌মহার্স্টের 'The Robbery of the soil' প্রবন্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন এ-প্রসঙ্গে তার কিছু অংশ স্মরণ করা যাক।—

"According to us the poverty problem is not so important. It is the problem of unhappiness that is the great problem…Our

object is to try to flood the choked bed of village life with streams of happiness···

···Most of us who try to deal with the poverty problem think of nothing else but of a greater intensive effort of production, forgetting that this only means a greater exhaustion of materials as well as of humanity, and this means giving a still better opportunity for profit to the few at the cost of the many. But it is food which nourishes and not money. It is fullness of life which makes us happy and not fullness of purse. Multiplying materials intesifies the inequality between those who have and those who have not. This is the worst wound from which the social body can suffer. It is a wound through which the body is bled to death !"[১৭]

সাম্য তো দূরের কথা, দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণকেও তিনি সর্বদা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন নি। দারিদ্র্য দূর না করেও মৃতপ্রায় পল্লীকে কিভাবে প্রাণবান ও সুখী ক'রে তোলা যায়—এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিপরীত চিন্তাও তাঁর মধ্যে ছিল। অবশ্য দারিদ্র্য মোচনের জন্য তাঁর চিন্তা ও চেষ্টা অর্থনৈতিক সাম্যের লক্ষ্যে ধাবিত হয় নি। তিনিই রাশিয়ায় গিয়ে অধ্যাপক পেত্রভের সঙ্গে এক আলোচনায় বলেছেন—

"আমি রাশিয়ায় এসেছি শিখতে, আপনাদের লোকশিক্ষা ব্যবস্থা, জনসাধারণের জন্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজ, ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে, কারণ আমি মনে করি স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গটুকুও, ব্যক্তিত্বের মুক্তির সামান্যতম বিকাশও ভাবীকালের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ যদি আমরা অল্প কিছুও করতে পারি, একটি ছোটো ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রচেষ্টা সংহত হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই স্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যতে সোশিয়ালিজমে বিকাশ পাবে।"[১৮]

এই মন্তব্য যেমন বিস্ময়কর তেমনি অর্থবহ। রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করছেন, শুধু সমর্থন নয়—তার জন্য কাজ করার কথা বলছেন। এই সঙ্গে চোখে না প'ড়ে যায় যে, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা এখানে

প্রতিফলিত তা সর্বজনমান্য নয়—এমনকি, স্ববিরোধীও। সমাজতন্ত্র তাঁর মতে 'ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধন ব্যবস্থা'। অথচ তিনিই 'রাশিয়ার চিঠি'তে এবং অন্যত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নির্দয়ভাবে দমনের কথা, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তির উপর পীড়নের কথা বলেছেন এবং সেদিক থেকে কমিউনিস্টদেরকেও ফ্যাসিস্টদের সদৃশ মনে করেছেন। সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ ঝোঁক যে ব্যক্তি নয় সমষ্টি অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজ—এ তো সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথও যে জানতেন না তা নয়। তবু যখন তাঁর পূর্বোক্ত মন্তব্য চোখে পড়ে তখন কি বুঝবো? এ কি এক অসতর্ক ও চিন্তহীন মন্তব্যমাত্র, না যথার্থই মনের কথা? কোনো একটি মন্তব্যকে এরকম ঐকান্তিক গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হবে না। সম্ভবত এ এক তুলনামূলক বিচারের নিষ্কর্ষ। ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ অবাধ। রাশিয়া সম্বন্ধে কবির অভিমত ও ব্যাখ্যা মনে করা যাক।—

"শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই—'দুধু ভাতু খায় সেই'। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা।"[১৯]

শিক্ষার যোগেই যে ব্যক্তিত্বের মুক্তি সম্ভব—একথা তিনি আজীবন বলেছেন। সেই মুক্তির নিরবয়ব তত্ত্ব কি কল্পনা নয়, বাস্তব রূপ তিনি দেখেছিলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে। আলোচ্য প্রসঙ্গে সেই রূপচিত্রটি ফিরে দেখা দরকার।—

"আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়েছিল আজ তারা সমাজের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট,

সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।"[২০]

এই অভিজ্ঞতার পটেই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধন ব্যবস্থা। এজন্য জবরদস্ত একনায়কত্ব সত্ত্বেও তাঁর মনে হয়েছে, জীর্ণ এই যুগের একমাত্র আশা সোভিয়েত রাশিয়া। তাঁর এই আশা তথা বিশ্বাস অদ্যাবধি কতটা সার্থক হয়েছে কিম্বা তার সম্ভাবনা কতটা তা নিয়ে তর্ক হতে পারে এবং সে-তর্ক অন্তহীন হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ; তবু সন্দেহ নেই, কবি স্থিতাবস্থার বিরোধী এবং যেহেতু ঐ স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে মানবমুক্তির এক দুঃসাহসিক কর্মযজ্ঞে সমাজতন্ত্র—তাই তিনি আশায় উদ্দীপ্ত, তাই তিনি এর সমর্থক।

তাঁর সমর্থন ও আশাকে অগভীর ভাববার অবকাশ নেই। তাঁর সংবেদনা, চিন্তা ও কর্মের আনুপূর্বিক ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, মনের গহনে আয়োজন চলেছে অনেক দিন ধ'রে, আর তার আনুকূল্য করেছে সমসাময়িক বিশ্বপরিস্থিতি। মন প্রস্তুত বা অনুকূল ছিল ব'লে সমাজতন্ত্রের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াস দেখে তিনি অভিভূত, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সেই উদ্বোধ যে অক্ষয় পরমায়ু পেয়েছিল তা আমরা দেখেছি আগের অধ্যায়ে। তবু, অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে কবি যা লিখেছিলেন তার পুনরুল্লেখ এখানে অপরিহার্য। লিখেছিলেন—

"এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে? শুধু তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে নয়, তাদের মানরক্ষার জন্যে, তাদের অতিরিক্তের তহবিলকে স্ফীত রাখবার জন্যে।...

যখন সামনে এতবড়ো দুর্ভেদ্য নিরুপায়তা দেখি তখনি বুঝতে পারি যে এই দুর্বলের প্রতি নির্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুক্‌রো নিয়ে আমরা বাঁচব না।...

সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে

Scanned with CamScanner

তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি।"[২১]

এ হল ১৯৩৫ সালের কথা, রাশিয়ায় ঘুরে আসবার পাঁচ বছর পরের কথা। লক্ষণীয়, সোভিয়েত রাশিয়া তাঁর চোখে আগের মতোই 'তপোভূমি'। তীর্থ দর্শন ক'রে যে আনন্দ, আশা ও বিশ্বাস তাঁর মনে জেগেছিল, মানুষের ভাস্বর ভবিষ্যৎকে চাক্ষুষ ক'রে সেদিন যে আবেগে তিনি প্লাবিত হয়েছিলেন, বোঝা যাচ্ছে, তা আদৌ তাৎক্ষণিক ছিল না। সেদিন যা-কিছু তিনি দেখেছিলেন, যা-কিছু জেনেছিলেন, তার অনেকটাই স্থান পেয়েছিল তাঁর চৈতন্যের অমরাবতীতে। সেই পরিগ্রহ ও স্বকীয় চিন্তার উত্তরণকে সূত্রবদ্ধ করলে যা মেলে তা হচ্ছে এই :—

১. ধনতান্ত্রিক সভ্যতা 'নরমাংসজীবী'। এই সভ্যতায় স্বল্পসংখ্যক মানুষের প্রাণ-মান-মুনাফার জন্য অধিকাংশ মানুষকে 'উৎসর্গ' করা হচ্ছে। অতএব 'এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান' চাই।

২. সেই সমাধানের একমাত্র পথ সভ্যতার 'ভিত্তিবদল'। অন্য কোনো ভাবেই 'দুর্বলের প্রতি নির্মম' এই সভ্যতার কবল থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই।

৩. সোভিয়েত রাশিয়া সেই দুঃসাধ্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছে। 'প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপর রাশিয়ার এই সাধনা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 'এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান'।

৪. রাশিয়া যা করছে তাতে 'নানা ত্রুটি' আছে। তবু 'মানবের নবযুগের রূপ' রচিত হচ্ছে কেবলমাত্র সেখানেই। সেজন্য কবি 'আনন্দিত' ও 'আশান্বিত'। 'মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ' তিনি দেখেন নি।

সন্দেহ নেই, সোভিয়েত রাশিয়া তাঁর মনে নতুন এক বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে। সেই বিশ্বাস থেকেই উদ্ভিন্ন হয়েছে আশা। বিশ্বাস নেই অথচ আশা আছে—ভাবা যায় না। বিশ্বাস যেখানে আশা সেখানেই। বস্তুত, আশা বিশ্বাসের অনুগামিনী—ছায়ার মতো, দয়িতার মতো। যা বলবার রবীন্দ্রনাথ তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। বিপ্লব প্রসঙ্গে তাঁর অক্ষয় কিন্তু অক্ষম আপত্তির করুণ পরিণতি এক অনুত্তীর্য আত্মবিরোধের, এক অন্তরঙ্গ ট্র্যাজেডির ইংগিত দেয়। বিপ্লব—যাতে হিংসা আছে, আছে রক্তপাত—তাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করবেন কি করে? অথচ তিনি সভ্যতার 'ভিত্তি-বদল' চান এবং মর্মে মর্মে জানেন যে তা আপনা-আপনি হবার নয়। উপায় ও লক্ষ্যের দ্বৈত তিনি মানেন না; কিন্তু রাশিয়ায় সেই দ্বৈতের উপর গ'ড়ে উঠেছে যে নতুন মানবসমাজ—সমাজতন্ত্র যার নাম, তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত আত্মবিরোধকে ছাপিয়ে ওঠে নতুন বিশ্বাস ও আশা; অনুপ্রাণিত ভাষায় তিনি প্রার্থনা করেন সমাজতন্ত্রের সাফল্য।—

"কিন্তু সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ কথা মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যু-শেল তোলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে আপনিই জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক। দুর্ধর্ষপ্রতাপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহু কালের বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তেমনি ধনমদমত্ত সভ্যতার বিরাট কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বন্দী যেন একদা মুক্তি পায়।"[২২]

উল্লেখপঞ্জী

১. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬৭৯
২. তদেব। পৃঃ ৭০৭
৩. হেমন্তবালা দেবীকে লেখা দুটি চিঠির অংশবিশেষ এখানে স্মরণীয়। ১৯৩১

সালের ১৪ই জুন কবি তাঁকে লেখেন, "আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়।" ঐ বছরই ২৩শে জুন আবার লেখেন, "মানুষকে অন্নবস্ত্রবিদ্যা, আরোগ্য, শক্তি সাহস দিতে হবে এই সাধনায় যারা আত্মনিবেদন করেচে তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক্ বা না মানুক্ তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেচে, সেই মহান আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্মাকে, যাঁকে জানলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে থেকে বাঁধা অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁরা পূজাকে নিঃশেষিত করে তৃপ্তিলাভ করতে পারেন না, কেননা, তাঁরা মনের মানুষকে দেখেচেন মনের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নিত্যকালের বেদীতে। দেশ বিদেশের সেই সব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্মভাই বলেই জানি।"

—চিঠিপত্র (৯) পত্র সংখ্যা ১৯ ও ২১

৪. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৭৩০

৫. 'রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ'। 'রাঢ়-বাঁকুড়া,' শারদ সংকলন, ১৩৮৮—
সম্পাঃ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৯

৬. গ্রন্থ পরিচয়, রাশিয়ার চিঠি। পৃঃ ১৫৫-৫৬

৭. তদেব। পৃঃ ১৫৫

৮. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর। পৃঃ ৮৭

৯. ছিন্নপত্রাবলী, রচনাবলী (১১)। পৃঃ ১০৭

১০. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬৮৫

১১. তদেব। পৃঃ ৬৭৫

১২. তদেব। পৃঃ ৬৭৬

১৩. তদেব। পৃঃ ৬৮০

১৪. তদেব। পৃঃ ৬৮১

১৫. তদেব। পৃঃ ৬৯৯

১৬. শুধু তাই নয়, ধনসাম্যও তাঁর একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে নি রাশিয়া ভ্রমণের আগে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সমবায়নীতি' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য—"একথা আমি বিশ্বাস করিনে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য

Scanned with CamScanner

কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্যপ্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে, কেউ বা টাকা জমাতে ভালবাসে, কারো বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা একাকারতা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক জগতেও যেমন মানবজগতেও তেমনি, সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে স্তব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে।"

—রচনাবলী (১৩)। পৃঃ ৪৩৫

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তীর্থে গিয়ে মানুষ শুধু নিয়েই আসে না—কিছু দিয়েও আসে। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই চিন্তাই বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন এ-জন্মের তীর্থে গিয়ে, মাত্র কয়েকমাস পরে।

১৭. Poet and Plowman—L. K. Elmhirst, 1975, P. 40-41

১৮. 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর। পৃঃ ৮২

১৯. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬৯৯-৭০

২০. তদেব। পৃঃ ৬৯৩

২১. চিঠিপত্র (১১)। পৃঃ ১৪৫-৪৬

২২. তদেব। পৃঃ ১৪৬

Scanned with CamScanner

বিরোধ ও বিরোধিতা

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি যে বস্তুবাদী জগৎতত্ত্ব তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বরবাদী জগৎতত্ত্বের বিরোধ স্বতঃসিদ্ধ। তেমনি অবধারিত তাঁর উদার-তান্ত্রিক প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যয়ের সংঘাত। শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টি ও শ্রেণীনির্বিশেষ দৃষ্টির মধ্যে যে ব্যবধান তা এক কথায় আশমান-জমিন; এজন্য সহজ নয় উভয় পক্ষের চিন্তায় বিনিময়। কিন্তু এ-ও সত্য যে, কোনো চিন্তাই স্বয়ম্ভূ ও অবচ্ছিন্ন নয়, সকলেরই শিকড় থাকে অর্থ-নৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থার মধ্যে। যেহেতু ঐ ব্যবস্থা ও অবস্থা অনড় নয়, তাই, একদা যাকে মনে হয় অসম্ভব তাও সম্ভব ক'রে তোলে নিত্য পরিবর্তনশীল জীবন, যাদের মনে হয় অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের মধ্যেও ঘটে যায় আদান-প্রদান—বদলে যায় সমস্তই। এমনি এক ঐতিহাসিক সংযোগ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ ও সমাজতন্ত্রে এবং সেই সংযোগ যে নিতান্তই বিরোধে নিঃশেষ হয় নি তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। যিনি এই জীবনকে দেখেছেন এক ব্যক্তিত্ববান পরম সত্তার লীলা রূপে, তিনিই রুশ-বিপ্লবে শুনেছেন বিশ্ববাণী, আশীর্বাদ করেছেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে। এ যেমন একদিক, তেমনি অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের কোনো কোনো প্রত্যয়ে ও প্রকল্পে তিনি বিমর্ষ বোধ করেছেন, আশংকায় আকুল হয়েছেন কোনো কোনো প্রয়াসে—এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতাও করেছেন দৃঢ়ভাবে। বিরোধ ও বিরোধিতার সেই সূত্রগুলিকে এবার একত্র দেখা দরকার।

সমাজতন্ত্রের যা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সেই সাম্য ও মানবমুক্তির সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ উপায় নিয়ে, উদ্দেশ্য ও উপায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্নে। এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিয়েছে হিংসা, বল-প্রয়োগ ও একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা। একই কারণে বিপ্লবকে—যে বিপ্লবের কোনো না কোনো স্তরে বলপ্রয়োগ অনিবার্য—রবীন্দ্রনাথের

Scanned with CamScanner

পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। হিংসায় ও বলপ্রয়োগে অন্য পক্ষের আপত্তি নেই। বস্তুত মার্ক্‌সীয় মতে বলপ্রয়োগ ও হিংসা অপরিহার্য। জীর্ণ গতায়ু সমাজের জায়গায় যখনই নতুন সমাজ উদ্ভূত হয়েছে, বদল ঘটেছে সামাজিক কর্তৃত্বের, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিবার্য হিংসাত্মক সংগ্রাম ঘটেছে নূতন ও পুরাতনে। যে বুর্জোয়ারা আজ সামাজিক কর্তৃত্বের অধিকারী, একদা তাদের ঘোরতর সংগ্রামে পর্যুদস্ত করতে হয়েছিল সামন্ততন্ত্রকে। যেহেতু তারা দুর্যোধনের মতোই বিনাযুদ্ধে সূচিপরিমাণ অধিকারও ছাড়তে অনিচ্ছুক, এবং যেহেতু সেটাই তাদের শ্রেণীচরিত্র, সেহেতু বলপ্রয়োগ অনিবার্য ও অপরিহার্য।[১] কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে বলপ্রয়োগে, হিংসায় ও সংঘাতে রবীন্দ্রনাথ সম্মত হতে পারেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস : মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য উপায়কেও মহৎ হতে হবে, উপায়ের দোষ বা পাপ উদ্দেশ্যকে স্পর্শ করে, বিকৃত করে—শেষে বিনষ্ট করে। 'রাশিয়ার চিঠি'র এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন—

"সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।"[২]

উদ্দেশ্য ও উপায়ের নৈতিক অভিন্নতায় তাঁর বিশ্বাস তিনি নানা সময়ে নানা রচনায় ব্যক্ত করেছেন। কল্যাণসাধনেও জবরদস্তির ঘোরতর বিরোধী তিনি। কারণ, তাতে 'অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়'। হিংসা ও বলপ্রয়োগ যেখানে সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধতা। এদিক থেকে কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্টদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি করেন নি। উভয় পক্ষকেই কখনো বলেছেন 'হিংস্র শ্বাপদ', কখনো 'গুণ্ডাতন্ত্র', কখনো 'মানুষখেগোর দল'। সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে নানা দিক থেকে মুগ্ধ করেছে, আশান্বিত করেছে। সেকথা যেমন প্রাণ খুলে বলেছেন, তেমনি সরাসরি বলেছেন—

"But I find here certain contradictions to the great mission which you have undertaken. Certain attitudes of mind are being cultivated which are contrary to your ideal.

I must ask you : 'Are you doing your ideal a service by arousing in the minds of those under your training, anger, class-hatred, and revengefulness against those not sharing your ideal, against those whom you consider to be your enemies ? True, you have to fight against obstacles, you have to overcome ignorance and lack of sympathy, even persistently virulent antagonism. But your mission is not restricted to your own nation or own party, it is for the betterment of humanity according to your light. But does not humanity include those who do not agree with your aim ?...You may consider the men who hold them as misguided. But it should all the more be your mission to try to convert them by pity and love, realizing that they are as much a part of humanity as the peasants whom you serve.

If you dwell too much upon the evil elements in your opponents and assume that they are inherent in human nature meriting eternal damnation, you inspire an attitude of mind which with its content of hatred and revengefulness may some day react against your own ideal and destroy it. You are working in a great cause. Therefore you must be great in your mind, great in your mercy, your understanding and your patience...

...Violence begets violence and blind stupidity. Freedom of mind is needed for the reception of truth ; terror hopelessly kills it. The brute cannot subdue the brute. It is only the man who can do it.

...Therefore, for the sake of humanity I hope that you may never create a vicious force of violence which will go on weaving an interminable chain of violence and cruelty."...[৩]

মস্কো ছেড়ে চলে আসবার দিন 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে কবি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। যাকে বলেছেন তীর্থ, বলেছেন তপোভূমি, আধুনিক পৃথিবীতে একমাত্র আশার স্থল মনে হয়েছে যে দেশকে, সেখানে দাঁড়িয়েই যে এই সমালোচনা-স্পৃষ্ট মন্তব্য তিনি করেছিলেন—এ তথ্যের তাৎপর্য গভীর। তাঁর এই অপ্রিয় সত্যভাষণ, হিংসার বিরুদ্ধে অকপট ও অনমনীয় মনোভাব, হিংস্রতার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে

সতর্কবাণী ও উপদেশ—তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যকে বহন করছে। বর্বরতা দিয়ে বর্বরতাকে নির্মূল করা যায় না, তাতে বরং নিহত হয় মনুষ্যত্ব। তাই যদি হয় তবে বাকি থাকে কি ? এ প্রশ্ন শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, সকল উদারতান্ত্রিকের। শ্রেণীবিদ্বেষ ও শ্রেণীশত্রুতাকে স্বাভাবিক-ভাবেই কবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই সঙ্গে দাবি করেছেন সর্বজনের মনের ও মতের স্বাধীনতা, বিজয়ী শ্রেণীর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা। বিরুদ্ধ মতকে বলপূর্বক দলন ও দমন করলে পরে যে তা মর্মান্তিক প্রত্যাঘাত হানতে পারে, হানতে পারে মৃত্যুবাণ—সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন হিতৈষীর আন্তরিকতায়।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় মনন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব, সকল মানুষকে রাষ্ট্রের মতানুবর্তী করবার যান্ত্রিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নি। 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহার অংশে তাঁর অসন্তোষ ও সমালোচনা বেশ বিস্তৃতভাবেই বিবৃত করেছেন। সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু মনে করা যাক।—

"সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার এক প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।···

যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে, ও-সব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধ-কালের অবস্থা ; অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষা পণ্ড করে দেবার জন্যে চারি দিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক-তরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে

Scanned with CamScanner

স্বীকার করে।

রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো ; পুরাতন বিধিবিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া ; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না—স্পর্ধা বেড়ে ওঠে ; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে, একথা ভুলে যায় ; মনে করে তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা 'সীতাহরণ' ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে ; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।

যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ড-নায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগে-ভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ও দিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্র-বাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে ; সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়—এ কথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো-এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না। বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপমান।"[৪] এ থেকে স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাশিয়ার তদানীন্তন পরিস্থিতির যথাযথ বিবেচনার পরও, সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের বক্তব্য অনুধাবন করবার পরও, কবি নিজের বিশ্বাসে অবিচলিত ছিলেন।

ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায় যে ব্যবস্থা, রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতায় অনমনীয় ও অকুণ্ঠ। তাঁর কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের মূল্য পরম।[৫] দেশ, কাল ও শ্রেণী নির্বিশেষে বিষয়টিকে তিনি

দেখেছেন। এই দৃষ্টিতে ও এই মূল্যে মণ্ডিত ক'রে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেও দেখেছেন। সে-দেখায় আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে ইতিহাস এঙ্গেল্স উদ্ঘাটন করেছেন তাতে—দুস্তর ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের ধারণা টি. এইচ. গ্রীণের মতো অনেকটা। দুজনেই এবিষয়ে উদারতান্ত্রিক, কিন্তু চরম ব্যক্তিবাদী নন কেউই; দুজনেই চান ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমগ্র সমাজের একটা অবিরোধী সম্পর্ক গড়ে উঠুক। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হ'ত, তা হলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতন উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না; সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি-বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরোধ।

এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।"[৬]

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.............

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই ধারণায় ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় পার্থক্য একেবারে গোড়া-ঘেঁষে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটাবার কথা বলেন নি।[৭] তবে উদ্ধৃত অংশটিকে এ-বিষয়ে তাঁর মনোভবের পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র চিত্র ভাবলে ভুল ঘটে যাবে। পরশ্রমজীবী বা পরোপজীবী হয়ে বেঁচে থাকার বেদনা ও লজ্জার কথা তিনি নিজে ব্যক্ত করেছেন পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে, পত্রে। ভূসম্পত্তি তথা জমিদারী নিয়ে তাঁর মনে যে বিপরীতমুখী চিন্তাও ছিল এবং সে-চিন্তা যে দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করেছিল সে-ইতিহাসের পুনরুক্তি বাহুল্য। ঐতিহাসিক নানা পরিবর্তনের পর একালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে গুরুতর সমস্যার উৎস হয়ে উঠেছে—এই ভাবনাও তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। রুশ ভ্রমণের অনেক আগে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এল্‌মহার্স্টের 'The Robbery of the Soil' ভাষণের মুদ্রণকালে কবি যে ভূমিকা লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন—

"But, with the rise of the standard of living, property changes its aspect. It shuts the gate of hospitality which is the best means of social communication. Its owners display their wealth in an extravagance which is self-centred. This creates envy and irreconcilable class division. In other words property becomes anti-social.

Because property itself, with what is called material progress, has become intensely individualistic, the method of gaining it has become a matter of science and not of social ethics. Property and its acquisition break social bonds and drain the life sap of the community. The unscrupulousness involved plays havoc the world over and generates a force that can coax or coerce peoples to deeds of injustice and wholesale horror."[৮]

মৌলিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও এই উপলব্ধির দৌলতে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতের নতুন সমাজব্যবস্থা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। ধনগরিমা ও ধনমোহ থেকে মানুষের মুক্তি তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল সে-উদ্দেশ্যে জবরদস্তিতে; কেন না তাতে হস্তক্ষেপ ঘটে ব্যক্তির স্বাধীনতায়, মনুষ্যত্বের মর্যাদায়।

ব্যক্তিমনের সৃজনশীলতায়, তার উৎকর্ষে ও মহত্ত্বে, প্রবুদ্ধ ব্যক্তিসত্তার আত্মোৎসর্গে—মানবপ্রগতির পদাঙ্ক তিনি লক্ষ্য করেছেন। মানবমুক্তির প্রশ্নেও ব্যক্তির উপর তাঁর বিশ্বাস অগাধ, কখনো কখনো মনে হয় একান্ত। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় মানবমুক্তির ভিন্ন এক প্রকল্পকে রূপায়িত হতে দেখে তিনি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদেশে ব্যক্তির মূল্যহ্রাসে, ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞায় ও লাঞ্ছনায়, তার স্বাধীনতার সঙ্কোচনে মর্মাহতও হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর ক্ষুব্ধ মন্তব্য—

"...মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।"[৯]

"মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, এক দিকে সে স্বতন্ত্র আর-এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে পড়ে মানুষ এক দিকেই উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে তখন পরামর্শ-দাতা এসে সঙ্কটটাকে সংক্ষেপ করতে চান, বলেন, অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, স্বার্থ থেকে স্ব'টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তাহলেই সমস্ত ঠিক চলবে। তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।"[১০]

তাঁর মতে, ধনতন্ত্রের নীতিহীন ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রতিবাদে সমষ্টিতন্ত্রের বা সাকল্যবাদের উদ্ভব। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রকেও অনুরূপ এক প্রতিক্রিয়া রূপে তিনি দেখেছেন। তাঁর কথায়—

"বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে, এও সেইরকম কাণ্ড। মানব-সমাজে সামঞ্জস্য

Scanned with CamScanner

ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠেছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে? অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যে দিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।"[১১]

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেহেতু সাকল্যবাদী সেহেতু কবি তাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করতে পারেন না। সকল উদারতান্ত্রিকের মতোই তার বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি। তাঁর জীবনদর্শনে ব্যক্তির ভূমিকা যেহেতু ঐকান্তিক সেহেতু ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তিনি; আবার ঐ যুক্তিতেই সর্বহারার একনায়কত্বও তাঁর পক্ষে সমর্থনযোগ্য নয়। আরও যা চোখে পড়ে তা এই যে, রাশিয়ার সর্বহারার একনায়কতত্ত্বের মধ্যেও ব্যক্তি বিশেষের এক-নায়কত্বকে তিনি দেখেছেন। তাঁর ঐ দেখায় যে ভুল ছিল না, তত্ত্বত যাই-হোক না কেন, বস্তুত স্ট্যালিন যে একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন—সে-বিষয়ে আজ আর কোনো তর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

তাছাড়া অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়।"[১২]

একনায়কত্বের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য তিনি বিশদ ও বিস্তারিত ক'রে বলেছেন।—

কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী করে, অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর ; তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে ; তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে— এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।…

ডিক্‌টেটরশিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি।"[১৩]

একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে-সব আপত্তি কবি এখানে তুলেছেন তাতে যুক্তিবাদী কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। অবশ্য তাঁর সমালোচনা ও বিরোধিতা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি সুস্পষ্ট তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গতানুগতিকতা। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব ও সর্বহারার একনায়কত্বকে তিনি ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিতে দেখেন নি, তত্ত্বগতভাবেও পৃথক ক'রে দেখেন নি। বাস্তবে তখন রাশিয়ায় সর্বহারার একনায়কত্ব চলছিল, না স্ট্যালিনের—প্রশ্ন এটা নয়, প্রশ্নটা তত্ত্বগত। যেভাবে দেখেছিলেন লেনিন, যে প্রজ্ঞায়, ইতিহাস চেতনায়, ও দূরদৃষ্টিতে তিনি প্রতিপন্ন করেছিলেন ঐ তত্ত্ব[১৪], রবীন্দ্রনাথ সেভাবে দেখেন নি ; তাই স্বাভাবিকভাবেই ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খোঁজা বৃথা। তিনি যা চোখে দেখেছিলেন, জেনে-

Scanned with CamScanner

ছিলেন নানা সূত্রে—তার বাইরে পা বাড়ান নি। ঐ অভিজ্ঞতায় আপত্তিকর যা তা দেখেছি; এবার দেখা দরকার তা ছাড়াও কিছু আছে কিনা। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব, ব্যষ্টির উপর সমষ্টির পেষণ, হিংসা ও বলপ্রয়োগ, রাষ্ট্রের কঠিন শাসন, সাকল্যবাদ—এই সব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অকপট ও অবিচলিত বিরুদ্ধতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চোখে না পড়ে যায় না কিছু পর্যবেক্ষণ এবং তা নিয়ে ভিন্নমুখী ভাবনা। যেমন—

"একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এর মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে এক ঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতিপ্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।

মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্য দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থ দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।"[১৫]

জবরদস্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ যদিও কমিউনিস্টদের অনেক সময় ফ্যাসিস্টদের সগোত্র জ্ঞান করেছেন, তবু, উদ্ধৃত অংশের অনুপুঙ্খ অনুধাবনে বোঝা যায় যে, সেটাই তাঁর সব কথা বা শেষ কথা নয়। অধিকন্তু, সর্বহারার এক-

Scanned with CamScanner

নায়কত্বের যে রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাশিয়ায় তাতে অভিনব কিছু দিকও তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল এবং সেই অভিনবত্ব তাঁর বিবেচনায় তুচ্ছ নয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রটি হল সোভিয়েতের মূলনীতি অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক নীতি ও নির্মাণের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার সমালোচনা ও উদ্যমকে সোভিয়েত শাসন সহ্য করে না, এবং তা দমন করে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে। এদিক থেকে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে তাদের মিল। কিন্তু মানুষকে মনের দিক থেকে সংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত, সমর্থ ও প্রত্যয়শীল ক'রে তোলায় তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। এদিক থেকে তারা ফ্যাসিস্টদের বিপরীত। এই বৈপরীত্য কবির বিবেচনায় মূল্যবান। এইখানেই তিনি দেখেছেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্ববিরোধ থেকে উত্তরণের সামর্থ্য—যা নিয়ত বর্ধমান, দেখেছেন একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদ, দেখেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিত্রাণের পথ। যেরকম জোরের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের দ্ব্যর্থহীন বিরোধিতা তিনি করেছেন, সেই রকম জোরের সঙ্গে না হলেও—অন্তত একই আন্তরিকতায় বিশ্বের প্রথম সর্বহারার একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে ভিন্নার্থক কিছু মন্তব্যও করেছেন ; ফলে বিরোধিতার মধ্যেও একটি সহিষ্ণু ও জিজ্ঞাসু মনের স্পর্শ পাওয়া যায়। সেই মন যখন সোভিয়েত ব্যবস্থাকে তলিয়ে বুঝতে চেয়েছে তখন ব্যক্তি-বিশেষের একনায়কত্বের সঙ্গে সর্বহারার একনায়কত্বের প্রকট পার্থক্য উপেক্ষা করতে পারে নি। যেমন—

"দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয় ; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্বব্যাপী একটা ধর্মমূঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল। সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতি সহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন।...

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই

Scanned with CamScanner

শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি—একদা সে-পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত করে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল্ আছে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ, এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থ নৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে।...

বর্তমান রাশিয়ায় নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়—অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে, সিনেমাযোগে, ইতিহাসের ব্যাখ্যায়, সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে ঘৃণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে আর কিছু না হোক অদ্ভুত ভুল বলতে হবে"।[১৬] সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর শাসনের অভিযোগ মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সেই সরকারের সৎ উদ্দেশ্য ও আন্তরিক উদ্যমকে যেভাবে সর্বোপরি তুলে ধরেছেন, যেভাবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি প্রবল ঘৃণা উৎপাদনের সর্বাত্মক প্রয়াসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, তাতে, ঐ অভিযোগ ও তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে অত্যন্ত অমিল চোখে পড়ে।

সর্বহারার একনায়কত্বকে তিনি ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব থেকে পৃথক কোনো মানদণ্ডে বিচার করেন নি। বস্তুত ঐ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ও ঔৎসুক্যও প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ঐ একনায়কত্বের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, আংশিক হলেও অন্যবিধ একনায়কত্ব থেকে তার ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা তাঁর কাছেও প্রতীয়মান হয়েছিল। সেই স্বাতন্ত্র্য, বলা ভালো চারিত্র, এমন মানবিক মূল্যে মণ্ডিত যে, তাঁর একনায়কত্ব-বিরোধী মনও অভিভূত না হয়ে পারে নি। বদ্ধমূল ধারণা ও অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যার

বিরোধিতা করেছেন তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় নি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ; ফলে প্রবল ও অকপট বিরোধিতার মধ্যেও জেগে উঠেছে বিবাদী ভাবনা, বিরোধিতাকে দুর্বল ক'রে দিয়ে একেবারে ভিতর থেকে উঠে এসেছে ভিন্ন এক কণ্ঠস্বর। মনে করা যাক সেই চিঠি যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"...কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে, সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব।...কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই—সাধারণের চিত্ত, কাজ, সাধারণের সত্ত্ব বলে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগেছে।"[১৭]

এই যদি হয় তবে সে-দেশকে 'নীড়' না ব'লে 'খাঁচা' বলা যাবে কোন্ যুক্তিতে? কবির বিবরণে যখন দেখি রাশিয়ায় জনগণের ভাগ্য তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত হয়েছে তখন মনে হয়, নিজের যুক্তিকে তিনি নিজেই যেন খণ্ডন করছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই আত্মখণ্ডন কি কোনো আত্মগত বোঝাপড়ার ইঙ্গিত দেয়? একনায়ক-তন্ত্রে তাঁর প্রবল আপত্তি; কিন্তু রাশিয়ায় যা দেখলেন তা-ও যদি হয় একনায়কতন্ত্র, তবে তার সমস্তই তো আপত্তিযোগ্য নয়। ঐ একনায়ক-তন্ত্রকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু বিরোধিতাও যে অবিমিশ্র রইল না সেটা উল্লেখযোগ্য বৈকি। 'জবরদস্ত একনায়কে'র শাসন তাঁর মনঃপূত হয় নি, মনঃপূত হয় নি শ্রেণী-শত্রুর উপর বল-প্রয়োগ; কিন্তু সাধারণের এক 'অসাধারণ সত্তা' গড়ে তোলবার সাধনা তাঁকে অভিভূত করেছিল, এবং ঐ সাধনায় ও তাঁর অন্তর্গত সংস্কারে তিনি মিল খুঁজে পান নি।

এইরকম অমিল চোখে পড়ে বিপ্লব প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনায় ও নানা মন্তব্যে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিবদল তিনি চেয়েছেন, ডাক দিয়েছেন দানবের সাথে সংগ্রামের তরে, রুশ বিপ্লবের সাফল্য কামনা করেছেন, প্রার্থনা করেছেন ধনতন্ত্ররূপ জরাসন্ধের কারাগার থেকে মানুষের মুক্তি; অথচ এজন্য যে রক্তাক্ত বিপ্লব মার্ক্‌সীয় মতে অনিবার্য তাকে অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেন না, কেননা হিংসাকে তিনি মনে করেন বর্বরতা। এই দ্বিধা ও আত্মবিরোধ থেকে জন্ম নেয় যে আততি তার উত্তাপ ছড়িয়ে আছে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একাধিক পত্রে। সমাজতন্ত্রের সাধনা দ্বিপর্বিক। বুর্জোয়া রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন এবং সে জায়গায় সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা প্রথম পর্ব, আর দ্বিতীয় পর্ব হল সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্মাণ। পর্ব দুটি হলেও একের থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন নয়। নির্মাণের সময়েও চলতে থাকে ধ্বংসের কাজ এবং একই সঙ্গে প্রতিরোধ, নইলে অপ্রতিরোধ্য হবে প্রতিবিপ্লব। এই প্রক্রিয়া যে রবীন্দ্র-নাথের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল না তা বোঝা যায় 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লেই।[১৮] কিন্তু এই আক্রমণশীল প্রক্রিয়াকে তিনি সমর্থন করবেন কি করে? এই প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও কবির চিন্তায় কোনো-প্রকার সংহতি সম্ভব নয়। "মানুষের সকল সমস্যা-সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা।"—এ তাঁর স্থির প্রত্যয়। তাঁর মতে আগে শিক্ষার দ্বারা মানুষকে তৈরি করতে হবে, বদলাতে হবে তার মতি, তারপর সেই মানুষ নিজের তাগিদেই ব্যবস্থার বদল ঘটাবে। এক কথায় তিনি বিপ্লববাদী নন, বিবর্তনবাদী। সুশিক্ষার গুরুত্ব অন্য পক্ষও মানেন; তবে তাঁদের মতে ব্যবস্থার বদল আগে না ঘটালে সেই শিক্ষা সকল মানুষ, অবমানিত শোষিত মানুষ পেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বিষয়টিকে দেখেছেন তত্ত্বগতভাবে এবং অবচ্ছিন্নভাবেও। তাঁর মতে, মানুষ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ না হলে, যথার্থ শিক্ষা না পেলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে লোককল্যাণের আয়োজন; অশিক্ষিত মানুষ সহজেই ক্ষমতার শিকার হবে, সমাজবদল বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবে না। রাশিয়ায় লোকশিক্ষার ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত প্রসার কিভাবে সম্ভব হল রবীন্দ্রনাথ তা জানতে চেয়েছিলেন অধ্যাপক পেত্রভের

কাছে। এ-বিষয়ে উভয়ের যে আলাপ হয়েছিল তা থেকে উভয় পক্ষের মতপার্থক্য জলবত্তরলভাবে বোঝা যায়। সে-আলাপ অংশত উদ্ধার করা যাক।—

"রবীন্দ্রনাথ: আমার কৌতূহলের প্রধান বিষয় হল লোকশিক্ষা। আপনারা ব্যবস্থার বদল ঘটিয়েছেন, এ ঘটনা এখনই তেমন কিছু প্রত্যক্ষ ফল দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, এককালের শোষিত উৎপীড়িত জনসাধারণের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে কাজে লাগান—এ আপনাদের বিরাট কীর্তি। এ কীর্তি সব চেয়ে ভালো ফল না দিয়ে পারে না, জগৎটাকে আরো নিখুঁত করে তোলার সুযোগ তা দেবেই।

পেত্রভ: সব রকম আর্থনীতিক পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ ফল হল শিক্ষা, সংস্কৃতি।...আর্থনীতিক বিকাশের পাশাপাশি আমাদের এখানে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চলছে।...আর্থনীতিক ব্যবস্থার বদল ঘটানর ফলেই আমরা বারো বছরে সাক্ষরের সংখ্যাকে ৩০% থেকে ৬৫%-এ তুলতে পেরেছি।...

রবীন্দ্রনাথ: আপনি কি মনে করেন লোকশিক্ষার এই প্রসার কেবল আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলেই ঘটেছে?

পেত্রভ: তা বৈকি। তা না হলে আমাদের এই লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেত জানি না।...

রবীন্দ্রনাথ: আপনাদের অবস্থায় সাধারণজনের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের আগে যে (অর্থনীতির) প্রচলিত রূপকে ভেঙ্গে দেওয়া দরকার ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু জারের রাশিয়ায় জনশিক্ষা (Public education) থেকে জনসাধারণ যত দূরে ছিলেন অন্য অনেক দেশে তেমন হয় নি। ইংলণ্ড আর জার্মানীতে জনসাধারণ জনশিক্ষার ফল পেয়েছেন কিন্তু শোষণ, আর ধনতন্ত্রী উৎপাদনের প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সম্পদের স্বাভাবিক সংহতি বরবাদ করা হয় নি। সেখানেও সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসার সম্ভব, সম্ভব শিক্ষার ভিত্তিতে ব্যক্তির

Scanned with CamScanner

অন্তরের মুক্তিসাধন। আমার মতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের আমাদের যে সমস্যা—সেটা আভ্যন্তরিক। জনসাধারণ যখন শিক্ষিত হবেন, আত্মশক্তি লাভ করবেন, তখন জনশিক্ষা আর শাসন পদ্ধতির আমূল সংশোধন ঘটাতে পারবেন। বর্তমান অবস্থায় এটি জনশিক্ষা প্রসারে কিছুটা বাধা।...”[১৯]

এই আলাপ পড়বার পর সন্দেহ থাকে না যে, রাশিয়ায় শিক্ষার দ্রুত বিকিরণ দেখে যিনি আনন্দে প্লাবিত হয়েছিলেন, ঐ সাফল্যকে প্রায় অলৌকিক মনে হয়েছিল যাঁর, সেই রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত সাফল্যের মূলগত তত্ত্বকে সে-দেশের পক্ষে উপযোগী ব'লে মেনে নিলেও দেশোত্তীর্ণ এক সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলকে শিক্ষার প্রসার ও সমাজ-পরিবর্তনের পূর্ব-শর্ত রূপে মানতে তিনি সম্মত ছিলেন না। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভাবনা-চিন্তাই করেন নি, আজীবন কাজ করেছেন। তাই মনে হয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে পূর্ব-শর্তের কথা পেত্রভ বলেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি শুধুই তত্ত্বগত কারণে নয়, নৈতিকও সম্ভবত। ব্যবস্থার বদল ঘটানোর অর্থই বিপ্লব অর্থাৎ সংঘর্ষ, বলপ্রয়োগ, হিংসা ইত্যাদি—যা কিনা তাঁর মতে মনুষ্যত্বের অসম্মান, যার প্রভাবে স্বভাব-ভ্রষ্ট হয় মানুষ, যা পাপ এবং অন্তহীন পাপচক্রের জন্ম দেয়।

রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচুর প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু তার সমস্তই তাঁর ভালো লাগে নি। কোথায় তাঁর আশংকা ও আপত্তি তা বলেছেন এইভাবে—

“এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ ফেটে চুরমার হবে, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।”[২০]

যে ছাঁচের অভিযোগ তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি। ক্লান্তিহীন পৌনঃপুনিকতায় চিঠির পর চিঠিতে যাকে বলেছেন 'পাকা শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত', যার মধ্যে দেখেছেন 'নির্মাণ' ও 'সৃষ্টি' দুইয়েরই প্রতি লক্ষ্য, তারই মধ্যে তিনি আবার দেখেছেন একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলে মানুষকে গড়ে-পিটে নেবার দুশ্চেষ্টা। ফলে প্রশংসায় আর অভিযোগে সাযুজ্য সাধন অসম্ভব মনে হয়। ধ'রে নিতে আপত্তি নেই যে, ছাঁচটা যাই হোক না কেন, সেটা ছাঁচ বলেই কবির আপত্তি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যিনি অবাধ স্বাধীনতার দাবিদার, তাঁর শিক্ষাতত্ত্বেও স্বাধীনতা একটি মৌল নীতি। জিজ্ঞাসার স্বাধীনতা, মননের স্বাধীনতা, অনুশীলনের স্বাধীনতা, আচরণের স্বাধীনতা—এমনকি স্বাধীনতার অপব্যয়ের দুঃসাহসও মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে কাম্য ব'লে তিনি মনে করেন। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কঠিন কর্তৃত্ব তাঁর বিবেচনায় ক্ষতিকর। এবং 'গোড়ায় গলদ'। শিক্ষা যদি হয় 'অথরিটেরিয়ান', 'রেজিমেণ্টেড'—তবে তিনি তাঁর ঘোরতর বিরোধী। 'তোতাকাহিনী'র লেখক, 'তাসের দেশ' ও 'অচলায়তন'-এর নাট্যকার কি ক'রে সমর্থন করবেন 'একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত' করবার প্রয়াস? সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভাবুক ও নির্মাতা যাঁরা তাঁদের বিবেচনায় সেটা অত্যন্ত জরুরী। রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে কিছুই বুঝতেন না এমন নয়। বুঝতেন বলেই লিখেছেন—

"সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থি মজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে।"[২১] এ নিছক তথ্য-জ্ঞাপন নয়, ব্যক্তিগত আবেগে জারিত ব'লে এত জোর এর। ঐ আবেগ সত্য ব'লে রুশদের সাহস দেখে তিনি উল্লসিত বোধ করেছেন। 'বলাকা'র

কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা। নূতনের সাধনা যদি হয় স্বেচ্ছামূলক, ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবেই তাঁর পক্ষে তা সর্বতোভাবে গ্রহণ-যোগ্য। স্বাধীনতার এই উদারতান্ত্রিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও পদ্ধতির বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং সম্ভবত অমোচনীয়।

উল্লেখপঞ্জী

১. কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌স জানিয়েছিলেন—
"One thing especially was proved by the Commune, viz., that "the working class cannot simply lay hold of the ready-made State machinery and wield it for its own purposes."
পরবর্তীকালে লেনিন মন্তব্য করেছেন—"...it would be extremely stupid and absurdly utopian to assume that the transition from capitalism to socialism is possible without coercion and without dictatorship,"—Selected Work(2),1967 P. 668

২. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬৯০

৩. Letters from Russia, Appendix VI, P. 214-15

৪. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৭২৮-২৯

৫. এ-বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা ভোলবার নয়।—
"প্রবলপক্ষেরা সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্‌ব্যয়ের যে-শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত, আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাত-নিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়েছে। শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা,

আমাকে যাহা-কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই।...আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না, ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই ; ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিশের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে-দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর কিছুই নাই।"—রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬১

এই হল স্বাধীনতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর ও স্থির প্রত্যয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই একই প্রত্যয়ে তিনি আজীবন অবিচলিত ছিলেন।

স্বাধীনতার মূল্য যে তাঁর কাছে কী ছিল সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর একটি মন্তব্য থেকে। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—"মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটা এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।"—রচনাবলী (১৩)। পৃঃ ২৩৩

৬. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬৯০

৭. এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই মন্তব্য—

"There are some who believe that the eradication of the idea of property will give the communal spirit its full freedom. But we must know that the urge which has given rise to property, is something fundamental in human nature. If you have the power you may tyrannically do violence to all that constitutes property but you cannot change the constitution of mind itself.

Property is medium for the expression of our personality."

—'Wealth and Welfare', Modern Review, Feb. 1930.

৮. Poet and Plowman—L. K. Elmhirst, 1975, P. 33.

একই বক্তব্য আছে 'Wealth and Welfare' প্রবন্ধটিতেও ; এমনকি—প্রায় একই ভাষা স্থানে স্থানে।

৯. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৭১৭

১০. তদেব। পৃঃ ৭৩০

Scanned with CamScanner

১১. তদেব। পৃঃ ৭৩২

১২. তদেব। পৃঃ ৭১৭-১৮

১৩. তদেব। পৃঃ ৭২৬-২৭

১৪. লেনিনের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করবার জায়গা এটা নয়। সর্বহারার একনায়কত্বের তত্ত্বকে সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত ক'রে তোলা তাঁর একটি বড়ো কাজ। এই তত্ত্বের বিরোধিতা ও সমালোচনা যেহেতু কোনো-না-কোনো ভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে সেহেতু লেনিনের বক্তব্যের অন্তত ন্যূনতম উদ্ধৃতি একান্ত আবশ্যক। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে 'The Immediate Tasks of the Soviet Government' নামে যে 'থীসিস' তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করেন এবং যা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় তাতে লেনিন বলেন—

"··it is not difficult to see that during every transition from capitalism to socialism, dictatorship is necessary for two main reasons, or along two main channels. Firstly, capitalism cannot be defeated and eradicated without the ruthless suppression of the resistance of the exploiters, who cannot at once be deprived of their wealth, of their advantages of organisation and knowledge, and consequently for a fairly long period will inevitably try to overthrow the hated rule of the poor ; secondly, every great revolution, and a socialist revolution in particular, even if there is no external war, is inconcivable without internal war, i. e., civil war···" —Selected Works (2, 1967, P. 668-69)

১৯১৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসেও লেনিন এই তত্ত্ব পেশ করেন। সেই প্রস্তাবে তিনি আরও বলেন,

"Proletarian dictatorship is similar to the dictatorship of other classes in that it arises out of the need, as every other dictatorship does, to forcibly suppress the resistance of the class that is losing its political sway. The fundamental distinction between the dictatorship of the Proletariat and the dictatorship of other classes—landlord dictatorship in the Middle Ages and bourgeois dictatorship in all the civilised capitalist countries—consists in the fact

that the dictatorship of the landowners and bourgeoisie was the forcible suppression of the resistance offered by the vast majority of the population, namely, the working people. In contrast, ptoletarian dictatorship is the forcible suppression of the resistance of the exploiters, i. e., an insignificant minority of the population, the landowners and capitalists.

It follows that proletarian dictatorship must inevitably entail not only a change in democratic forms and institutions, generally speaking, but precisely such a change as provides an unparallaled extension of the actual enjoyment of democracy by those oppressed by capitalism—the toiling classes." —Selected Works (3), 1967, P. 134

১৫. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৭১৮

১৬. তদেব। পৃঃ ৭২৭-২৮

১৭. তদেব। পৃঃ ৬৯৯

১৮. প্রাসঙ্গিক দুটি উদ্ধৃতি :—

ক. "প্রায় বছর তেরো হল এরই [জার] প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল—তাদেয় অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগাল সাম্রাজ্যভোগীরা।"—তদেব। পৃঃ ৭০৫

খ. "আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য।"—তদেব। পৃঃ ৭১১

উক্ত কল্‌চাকের সহযোগী এক মার্কিন জেনারেল যে মন্তব্য করেছিলেন, জওহরলাল তা তাঁর 'Glimpses of World History' বইতে উদ্ধৃত করেছেন (পৃঃ ৬৫৫)। সেটি এই—"There were horrible murders committed, but they were not committed by the Bolsheviks, as the world believes. I am well on the side of safety when I say that the anti-Bolshevicks killed one hundred people in Eastern Siberia to every one killed by the Bolsheviks."

১৯. 'তীর্থদর্শন' এর পঞ্চাশ বছর। পৃঃ ৮০-৮৩

২০. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৬৭৬

২১. তদেব। পৃঃ ৬৭৯

Scanned with CamScanner

উপসংহার

সমাজতন্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তার পুরো ছবিটা এখন আমাদের সামনে। সে-ছবির কিছুটা তৎসাময়িক, কিছুটা ভাবীকালের। যা তৎ-সাময়িক তা অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি : অতএব তার মূল্য ঐতিহাসিক। আর ভাবীকালের যে-রূপকল্পগুলি জেগে উঠেছে সেই অভিজ্ঞতার মর্মমূল থেকে তার মূল্য তত্ত্বগত ; অতএব সময়-নিরপেক্ষ, অতএব অদ্যাবধি প্রাসঙ্গিক। রচয়িতাকে অনুসরণ ক'রে এতক্ষণ আমরা ছবিটাকে দেখেছি, দেখেছি তাঁর দেশ-কালের সীমা থেকে। এবার তাকে দেখে নিতে হয় বর্তমান দেশ-কালের সীমায়। সে-উদ্দেশ্যে প্রথমেই সূত্রাকারে সাজিয়ে নেওয়া দরকার সেই সব—যা দেখার, অর্থাৎ যা সংলগ্ন এই দেশে ও কালে।

রবীন্দ্রনাথের মতে—

১. মানুষের ইতিহাসের রথ চলেছে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে, ধনতন্ত্রের বিভীষিকার মধ্যে সেটাই একমাত্র স্থায়ী আশা ও আনন্দ।

২. ধনতন্ত্রের কবল থেকে মানুষের মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র। সভ্যতার ভিত্তি-বদল চাই, চাই একেবারে গোঁড়াঘেঁষে সমাধান। ধনের দাসত্ব থেকে, লোভের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তির নান্য পন্থা :

৩. হিংসা ও বলপ্রয়োগে স্থায়ী সমাধান নেই, শ্রেয় নেই। তাতে পাপের পথ প্রশস্ত হয়, হিংসা-প্রতিহিংসায় চক্রাবর্তন চলতে থাকে। বিপ্লব হল রাশীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ইতিহাসের কোনো কোনো সন্ধিক্ষণে তা অনিবার্য হলেও বিপ্লবের পথ স্বাভাবিক নয়, শ্রেয় নয়। শ্রেয় হল শিক্ষার দ্বারা মনের বদল ঘটিয়ে সমাজবদল।

৪. সমষ্টির নামে ব্যষ্টিকে খর্ব করলে চলবে না। চাই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য। অন্যথা ব্যষ্টি বিদ্রোহ করবে, যেমন ব্যষ্টিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল নানা রকমের সমষ্টিতন্ত্র।

৫. স্বাধীনতা ও সাম্য—দুইই অবিচ্ছেদে কাম্য। অসাম্য যেমন অধিকাংশ মানুষকে অমানুষ ক'রে রেখেছে, তেমনি স্বাধীনতার অভাবে মনুষ্যত্বের

Scanned with CamScanner

অসম্মান ও বিকৃতি ঘটে। অতএব কোনো প্রকার একনায়কত্ব নয়, নয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রও—তা হলে কি সেটা, কবি তা ব্যাখ্যা করেন নি। অবশ্য এটুকু বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের সাবলীল যুগ্মতা তাঁর ঈপ্সিত।

২.

এইসব সূত্রে বিধৃত যে চিন্তা, তার ক্রমপরিণতির পিছনে আছে পঞ্চাশটি বছর, ১৮৯১—১৯৪১। ঐ পঞ্চাশ বছরের পর আরও পঞ্চাশটি বছর পার হতে চলল। ইতিমধ্যে কত বদলে গেছে পৃথিবী, কত কাণ্ড ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, কিন্তু হিরোশিমা-নাগাসাকির পৈশাচিকতা বোধহয় কল্পনাও করেন নি; দেখেন নি উপনিবেশবাদের নূতন রূপ; চাক্ষুষ করেন নি য়ুরোপে-এশিয়ায় দেশে-দেশে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা, পারমাণবিক যুদ্ধ, রাসায়নিক যুদ্ধ এবং মহাকাশ যুদ্ধের মহড়ার মধ্যে দিনপাত করতে হয় নি তাঁকে। যে বিশ্বসংকটে তাঁর মতো উদারতান্ত্রিকও অসহিষ্ণু, অস্থির হয়ে উঠেছিলেন আজ তা অনেক বেশি ঘনীভূত ও ব্যাপ্ত, অনেক বেশি তীব্র, অনেক বেশি জটিল। আজ যেদিকে তাকাই সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে একটি দৃশ্য—এক তিলোত্তমার উপর মানুষ-জন্তুর ধর্ষণের বীভৎসতা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দিয়ে গড়া সভ্যতার সেই প্রতিমা আজ রক্তাক্ত, তার পাণ্ডুর কাতর মুখে বিধুর বিদ্রূপ, তার দৃষ্টির গভীর মৌনে বেদনা ও ঘৃণা, ধিক্কার ও অবিশ্বাস। এই নরক থেকে যখন আমাদের প্রিয় কবির দিকে তাকাই তখন আত্মগৌরবে রোমাঞ্চিত হই সত্য, কিন্তু আত্মীয়তার অব্যবহিত বোধে আপ্লুত হই না, হতে পারি না অন্তরঙ্গ। কেবলই মনে হয়—হায় রে, কবে কেটে গেছে রবি ঠাকুরের কাল!

৩.

কাল একাকী যায় না। সঙ্গে নিয়ে যায় অনেক চিন্তা, বিশ্বাস, স্বপ্ন—এবং আরো অনেক কিছু। সেই শূন্যতাকে ভ'রে দিতে আসে নূতন চিন্তা, নূতন বিশ্বাস, নূতন স্বপ্ন। কালের এই সঞ্চরণশীল পটভূমিতে যখন মনে পড়ে

Scanned with CamScanner

কবির নানা প্রগাঢ় উক্তি, তখন বুঝি—মানুষটি শুধু প্রবুদ্ধই নন, প্রবুদ্ধও বটে ; শুধু কবি হিসেবেই মহান নন, দ্রষ্টা রূপেও মহান। সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় তিনি দেখেছিলেন, দেখেছিলেন তার নির্মাণ। সেই নির্মাণ তাঁর মতে, ধনতন্ত্রের রাক্ষসবৃত্তির বিরুদ্ধে নিঃসহায় মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। সব বিষয়ে নিশ্চিত ও নির্দ্বিধ না হলেও তাঁর মনে হয়েছিল, সমাজতন্ত্র মানুষের ভবিতব্য। তার জয়যাত্রা অবধারিত, অপ্রতিরোধ্য, অমৃতময়। কালের মাত্রাকে চিনে নিতে তাঁর ভুল হয় নি। সমাজতন্ত্র এখন আর শুধু-মাত্র ব্রাত্যজনের মোক্ষের পথ নয়, এমন কি আমাদের এই সনাতন দেশেও না। সমাজতন্ত্র এখন আমাদের ঘোষিত জাতীয় নীতি ; যে-রূপেই হোক এই মোক্ষতত্ত্বকে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে এদেশের অধিকাংশ জাতীয় দল। অর্থাৎ এ-সত্য আজ আমাদের মতো ঐতিহ্যাভিমানী জাতিও অবশেষে বুঝেছে যে, সমাজতন্ত্রে রয়েছে আমাদের উদ্ধার, ঔপনিবেশিক ও ধনতান্ত্রিক অভিশাপ থেকে মুক্তি। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, নানা দেশে চলেছে তার জন্য সংগ্রাম ও সাধনা, বিশ্বধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সমুচিত মোকাবিলায় আজ সে প্রস্তুত ও পারঙ্গম।

এ হল চাঁদের আলো, কিন্তু চাঁদে তো কলঙ্কও আছে। যেহেতু এই চাঁদ প্রাকৃতিক নয়, মানবিক সৃষ্টি, সেহেতু একে কলঙ্কমুক্ত করবার দায়ও মানুষের। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কলঙ্ক[১] তা আসলে কিছু প্রশ্ন, কিছু অমীমাংসিত বিরোধ। সব থেকে বড়ো প্রশ্ন সাম্য ও স্বাধীনতার যুগ্মতার প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সেই যুগ্মতার অভাব আছে, আজও ঘটে নি সাম্য ও স্বাধীনতায় সাযুজ্য। ঘটে নি বলেই একদা হাঙ্গেরীতে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং ইদানীংকালে পোল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। একই কারণে সোভিয়েত রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাধীনতার সংগ্রাম অবিরাম। সরকারী প্রচার আমাদের যতই ভজাবার চেষ্টা করুক না কেন, 'নগ্ন দেবতা'কে আমরা দেখেছি। দেখেছি কত শত লেখক-শিল্পী-বিজ্ঞানীকে কারাগারে কি নির্বাসনে নির্যাতিত হতে, দেখেছি তাঁদের অনেককেই আত্মহননের মধ্যে প্রতিবাদ ও পরিত্রাণ খুঁজে

Scanned with CamScanner

নিতে। কার্ল জেস্‌পার্স যেমন সমষ্টিতন্ত্রকে পারমাণবিক যুদ্ধের মতো বিপদ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং সাম্যের আকাঙ্ক্ষাকে মরীচিকাপ্রীতি ব'লে উড়িয়ে দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পথ বাৎলেছেন[২], রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সেরকম নয়। ব্যষ্টিকে মেরে সমষ্টি বাঁচবে না, ব্যষ্টি তা মেনে নেবে না—একথা জোর দিয়ে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা রাজনীতিক—স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের নজর থাকে আশু ফললাভের দিকে। সেজন্য যা সুদূর তা তাঁরা দেখতে পান না অথবা দেখতে চান না। কবিরা বোধহয় অনেকেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারেন। যিনি কবি ও দ্রষ্টা তাঁর দৃষ্টি অনায়াসে পার হয়ে যায় নিকট সময়ের দিগন্ত। রবীন্দ্রনাথের কথা সেই দৃষ্টির উদ্‌ঘাটন। পুঁজিবাদী অপপ্রচারকে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বিংশ কংগ্রেসে গোপন ভাষণে ক্রুশ্চভ যে কলঙ্কিত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন খুলে দিয়েছেন তাকে অস্বীকার করা বা তাকে স্ট্যালিনের নিছক ব্যক্তিগত বিচ্যুতি রূপে গণ্য করা আত্মঘাতী মূঢ়তা।

একনায়কত্বকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সর্বহারার একনায়কত্বকে যদিও আলাদা ক'রে বিচার করেননি, তবু সন্দেহ নেই, তাঁর আপত্তি তাতেও। ইতিহাস কবির অনেক যুক্তিকেই সত্য ব'লে প্রতিপন্ন করেছে। লেনিন 'the mild leadership of a conductor of an orchestra'র উপমা দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে বিচ্যুতির সম্ভাবনা বিষয়েও সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন।[৩] তবু তাঁর হাতে গড়া সর্বহারার একনায়কত্বেই স্ট্যালিন হয়ে উঠেছিলেন এক নিষ্ঠুরতম একনায়ক—সাখারভের মতে যাঁর আসন হিটলারের পাশেই।[৪] সর্বহারার নাম ভাঙিয়ে দলীয় আমলাতন্ত্র ও মুষ্টিমেয়ের শাসন যে অনায়াসে কায়েম হতে পারে এবং সেই শাসন যে কী নিদারুণ বিচারমূঢ় ও নির্বিবেক হতে পারে তার প্রমাণ মিলেছে রাশিয়ায়, চীনে এবং অন্য দেশে। বলপ্রয়োগের দ্বারা অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বদল ঘটানো যায়, কিন্তু সকল বিরোধকে নির্মূল করা যায় না, জয় করা যায় না স্বভাবত স্বাধীন মানবচিত্তকে। ইতিহাস থেকেই জানি, নিউটনের গতিসংক্রান্ত তৃতীয় সূত্র হিংসার ক্ষেত্রেও সত্য। স্ট্যালিনের

রাশিয়ায় সংখ্যাতীত স্বজন-নিগ্রহ ও স্বজন-নিধনের ঘটনায় তাই শংকিত হওয়া স্বাভাবিক। বলপ্রয়োগ ও হিংসা সম্বন্ধে, একনায়কত্ব সম্বন্ধে, কবির সতর্ক-বাণীকে অচল উদারতান্ত্রিকতা অথবা নেহাত ধরতাই বুলি ব'লে উড়িয়ে দেওয়ায় না আছে যুক্তি, না ইতিহাসের সমর্থন। মনুষ্যত্বের প্রশ্ন তো তদতিরিক্ত, কিন্তু সর্বোচ্চ। মানবমুক্তির ঐকান্তিক আগ্রহে যিনি উদার-তান্ত্রিক সংস্কার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সর্বান্তঃকরণে সমাজতন্ত্রের সাফল্য কামনা করেছিলেন এবং একই সঙ্গে সমকালের উত্তেজনায় বাহিত না হয়ে দ্বিধাহীন ঘোষণায় জ্ঞাপন করেছিলেন আশঙ্কা ও আপত্তি, আজ তাঁকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই। বরং অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কালের প্রত্যুদ্‌গমন করেছিলেন তিনি। সেই সূত্রে আরো মনে হয়, তিনি শুধু আমাদের শ্লাঘনীয় অতীতের মহার্ঘ্য অনুষঙ্গই নন, তিনি এক অনুকম্পায়ী মহাপ্রহরী—এই বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত সময়েও, যখন দক্ষিণে ও বামে 'নানা অবান্তর নানা শিকারী শিকার'। মনে পড়ে তাঁর কথা—"ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই।"[৫] অক্ষরে অক্ষরে এর সত্যতা আজ প্রতীয়মান। এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন পরিত্রাণের পথ। পরিত্রাণ বলতে তিনি প্রতিবিপ্লব বোঝেন নি—যেমন বুঝে থাকেন অনেকেই, যেমন চেয়ে থাকেন অনেকেই। সমাজতন্ত্রে ও ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিরোধের অবসান তিনি চেয়েছেন, চেয়েছেন মনন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের মৌল আকাঙ্ক্ষা। এতে যাঁরা—সমাজতন্ত্র সুদৃঢ় ও স্বাবলম্বী হবার এতদিন পরেও ভয় পান, বুঝতে হবে ভয়ের কারণ শুধু বাইরে নয়, তাঁদের নিজেদের মধ্যেও।

৪.

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক নন। তাঁর ভাবনা-চিন্তাও তাই ঠিক রাজনীতিকের মতো নয়। তা ছাড়া—আমাদের থেকে ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন অভিজ্ঞতায়

আন্দোলিত হতে হতে আধুনিক বিশ্ব সমস্যার সমাধানের কথা তিনি ভেবেছিলেন। তাঁর সেই চিন্তাপ্রয়াসকে একালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন জাগে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তিনি চেয়েছেন, চেয়েছেন একেবারে গোড়াসুদ্ধ বদলে দেওয়া হোক সেই ব্যবস্থা—যার মূলে লোভ, লুণ্ঠন ও শোষণ। এই বদলই তো বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লবে তাঁর সমর্থন নেই। যে কারণে নেই তার পুনরুক্তি বাহুল্য। ব্যবস্থার বদলের আগে তিনি চান মনের বদল, সমাজ-বিপ্লবের আগে চান শিক্ষা-বিপ্লব। প্রশ্ন, কিভাবে সম্ভব হবে তা ? রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা যখন শোষকের হাতে তখন কারা করবে সেই বিপ্লব? করা যোগাবে তার অর্থ ও আনুকূল্য? নিশ্চয় সেই ক্ষমতাবানেরা নয়। তা যদি হত তবে তো সমস্যার উদ্ভবই হত না। প্রশ্নের শেষ এখানেই নয়। শিক্ষা-বিপ্লব নিছক শিক্ষার বিস্তার নয়, এমন শিক্ষার বিস্তার যার প্রভাবে মন যাবে বদলে, যে-বদলে ধীরে ধীরে বদল ঘটে যাবে প্রচলিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার। তা কি ক'রে সম্ভব ? কেউ কি স্বেচ্ছামৃত্যু চায়? কায়েমী স্বার্থই বা কেন তা চাইবে? তা হলে কি কতিপয় মহানুভব ব্যক্তির সদিচ্ছায় ও উদ্যমেই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ঘটে যাবে সেই শিক্ষা-বিপ্লব ? এমনি নানা প্রশ্ন ভিড় ক'রে আসে, বেড়ে ওঠে অভিজ্ঞতার আলোয়, পুষ্ট হয়ে ইতিহাসের বাতাসে। কবির মনেও এ-সব প্রশ্ন জেগে-ছিল কিনা জানি না। জেগে থাকলে কিভাবে তার মীমাংসা করেছিলেন তাও জানবার উপায় নেই। পেত্রভের সঙ্গে আলোচনাতেও তার কোনো ইঙ্গিত নেই। যেটা স্পষ্ট তা হল—শিক্ষার আগে ব্যবস্থার বদলে অর্থাৎ বিপ্লবে তাঁর আপত্তি। সে আপত্তি একালেও গ্রাহ্য কিনা—এ প্রশ্ন উঠবে। একদিকে উদারতন্ত্রের নিদারুণ ব্যর্থতা, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা, ভীরুতা ও আত্মবিক্রয়—এই অভিজ্ঞতার পরি-প্রেক্ষিতে কি হবে উত্তর ? এ এমন এক প্রশ্ন যার মীমাংসা মুলতুবি রাখা যায় না, কেননা প্রশ্নটা শুধুই তত্ত্বগত কি নৈতিক নয়, তার থেকেও বড়ো কথা প্রশ্নটা বাস্তব—যে বাস্তবে সংলগ্ন পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এ

Scanned with CamScanner

প্রশ্নে মতভেদ সুবিদিত, অতএব তর্ক নিরর্থক। উত্তর যাই হোক না কেন এবং তাতে যদি কবির আপত্তি বাতিল হয়েও যায়, তাঁর মতকে যদি মনে হয় 'ইউটোপিয়া', তবে তাতে তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না—যেমন ক্ষুণ্ণ হয় না মার্ক্‌স কি লেনিনের মহিমা যখন তাঁদের কোনো কোনো প্রকল্পকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী ক'রে তোলা হয়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কিছুই স্থির নয়; চিন্তা না, বিশ্বাস না, স্বপ্ন না; না সমস্যা, না সমাধান। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কিভাবে পর্বে পর্বে অতিক্রম করেছেন, ক্রমাগত নিজেকে সঙ্গত ক'রে নিয়েছেন ধাবমান সময়ের সঙ্গে—সে তো আমরা দেখেছি। আজীবন এই অগ্রগামিতা তাঁর মহত্তম বাণী। "পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা" চিরকাল চলে না। এই সত্য ভোলা উচিত নয়। ভোলা উচিত নয় তাঁর এই সতর্কবাণীও—

"সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে। আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ আক্রমণ করিয়াছে ।"[৬]

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যা সত্য রাজনীতি তার ব্যতিক্রম নয়। কোনো উত্তরাধিকারই ভেঙে ভেঙে জীবন-জাহ্নবীকে চিরস্থায়ী জটাজালে বাঁধা যায় না। তবু বাঁধার চেষ্টা হয়; যাঁরা তা করেন তাঁরা কালের প্রতিপক্ষ, প্রগতির প্রতিপক্ষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রতিপক্ষ।

উল্লেখপঞ্জী

১. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৭০৪

২. The Future of Mankind—Karl Jaspers, translated by E. B. Aston, 1973.

৩. The Immediate Tasks of the Soviet Government—Selected Works (2), 1967. P. 672)

৪. Progress, Coexistence and Intellectual Freedom—Andrei D. Sakharov, translated by the New York Times and published with an Introduction by Harrison E. Salisbury by Penguin Books, 1968.

৫. রচনাবলী (১০)। পৃঃ ৭১৮

৬. 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'—রচনাবলী (১৩)। পৃঃ ২৪৭

Scanned with CamScanner

নির্দেশিকা

অচলায়তন—১৮১
অনিল চন্দ—১২৭
'অপঘাত'—১৩৮
অবন্তী সান্যাল—৯
অমিতাভ চৌধুরী—১৪২, ১৪৬
অমিয় চক্রবর্তী—৪৫, ৪৬, ৯৬, ১৩১, ১৩৩, ১৫০, ১৫৯, ১৭৮
'অমৃত'—১৩৫
অলকা—১৩৮
Autobiography (Nehru)—৪৯
'Organisation'—৩৬
আ. আরোসভ—৮৭, ১২৭, ১৩৪
আইনস্টাইন—৯০
আনন্দবাজার পত্রিকা—৮০
'আফ্রিকা'—৪৪
আঁরি বারবুস—৩৯
আরিয়াম্ উইলিয়াম্স—৯৬, ১২৭
'আহ্বান'—৪৭, ৪৮, ৫১
ইজ্ভেস্তিয়া—১২১, ১৬৫
ইন্দিরা দেবী—১২৪
International Literature—১২৭
International Relations—৩০
William Morris—৫৬
এঙ্গেল্স—৬১, ১৫৫, ১৬৯, ১৮২
এণ্ডরুজ—৯, ১৯, ২৮, ২৯, ৩৮
এল্মহার্স্ট—৫০, ১৫৫, ১৬৩, ১৭০
A History of Socialist thought—১৪০
'At the Cross Roads'—৬৫
Ethics of Socialism—৫৬
ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ—১৪১
'Wealth and Welfare'—১৮৩
কবিকাহিনী—১২
'কবি-কথা'—১৪৬
কবির সঙ্গে য়ুরোপে—১৪১
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো—১৮২
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—১৯২
'কর্মের উদার'—৫৪
কাউণ্ট কাইসারলিঙ্—৫
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—১৪৫
কার্ল জেসপার্স—১৮৮
কালান্তর—৪০, ৪৮, ১৩১
'ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্ম'—৫৪
ক্রুশ্চভ—১৮৮
Creative Unity—২৮
Clarte—৬৮
খৃষ্ট—৪৭
গল্পসল্প—১৩৬
গীতবিতান, কালানুক্রমিক সূচী—৫১
গীতাঞ্জলি—৫
Glimpses of World History—১৮৫
ঘরে বাইরে—৭০
চিঠিপত্র (৪)—১৪৬
চিঠিপত্র (৫)—১৪৫
চিঠিপত্র (৯)—১৪৬, ১৬২
চিঠিপত্র (১১)—৫১, ১৪৬, ১৬৩
চিন্মোহন সেহানবীশ—১৪০, ১৪৫
'চীনে মরণের ব্যবসায়'—১২
ছিন্নপত্রাবলী—৬২, ১৪০, ১৬২

জওহরলাল/নেহেরু—২৬, ৮৮, ৮৯, ৯৭, ১১২, ১১৪, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৮৫
জীবনস্মৃতি—১৮২
টি. এইচ. গ্রীণ—১৬৯
ডাকঘর—৪৭
তাসের দেশ—১৮১
'তীর্থ দর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর—১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৬২, ১৬৩, ১৮৫
দ্বারকানাথ—৫
'The Child'—১০২
The Hindu—৮৯
The Future of Mankind—১৯২
The Modern Review—৩৬
The Manchester Guardian—৩৪
The Nation—১৯
'The Robbery of the Soil'—৫০, ১৫৫, ১৭০
The Religion of Socialism—৫৬
The Religion of Man—১০২
The Spirit of Japan—১৯
The Statesman—৪১
নগ্ন দেবতা—১৮৮
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—১২৯
নন্দলাল বসু—১০০, ১০১, ১২৬
'নবজাতক'—৬৭
নিউটন—১৮৯
নির্মল কুমারী মহলানবিশ—৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯৯, ১০৩
নির্মাণ ও সৃষ্টি—১৪২
নির্মীয়মান সোভিয়েত ইউনিয়ন—১২৭
নীতীন্দ্রনাথ—১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১
নেপাল মজুমদার—৫০, ৫১
নৈবেদ্য—১৩, ৪৪, ৪৮
Nationalism—১৩, ১৫, ১৯, ৪৯
'Nationalism in India'—১৯
'Nationalism in Japan'—১৯
'Nationalism in West'—১৯
New York Herald—৯০
পথে ও পথের প্রান্তে—১০২
পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি—৩৪
পারস্যে—১৩০
পিতৃস্মৃতি—৭৯, ১৪১
পূরবী—৬৩
পেত্রভ—৯৮, ৯৯, ১০৩, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৪২, ১৪৫, ১৫৭, ১৭৮, ১৮০, ১৯১, ১৯২
প্রবাসী—৩১, ৬৩, ১২৩, ১২৪
প্রভাতকুমার—১৮, ৫১
প্রমথ চৌধুরী—৭১, ৮২, ১৩৮
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ—১৩৯
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'—১৪
প্রান্তিক—৪৩
Poet and Plowman—১৬৩
Progress, Coexistence and Intellectual Freeom—১৯২
ফর্মিকি—৮৩
Fabian Essays in Socialism—৫৪
বঙ্কিমচন্দ্র—৫৩
বঙ্গদর্শন—৫৩
'বড়ো খবর'—১৩৬, ১৫১
'বাতায়নিকের পত্র'—৪৯
বার্নাড শ—৫৪
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—১৪২, ১৪৩
'বিজয়ী'—৬৩, ৬৫, ৬৮
'বিরোধমূলক আদর্শ'—১৪
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—৪৯, ৫০

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৮২, ৮৩
বেলফর্ট ব্যাক্স—৫৬
Visva Bharati Bulletion—১১৯
ভবতোষ দত্ত—১৪০
ভারতবর্ষ (রম্যাঁ রলাঁ)—১৪১
'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'—১৪০
'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা'—৮৭
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ—৫০, ৫১
মতিলাল—৮৯
'মন্ত্রি অভিষেক'—১২, ৭৫
মহাত্মাজী—৭৬
মানবেন্দ্রনাথ রায়—৮২, ৮৩
মার্কস—৫৩, ৫৬, ৬১, ১১৮, ১২৪, ১৫৫, ১৮২, ১৯২
মার্গারিটা আইনস্টাইন—৯৬
মিল—৫৩
মুক্তধারা—৩১, ৩৪
মুসোলিনী—৩৭, ৩৮, ৮২, ৮৫, ৮৬
'মেঘ ও রৌদ্র'—১২
মৈত্রেয়ী দেবী—৪৯
ম্যাক্সিম গোর্কি—১২৭
Magyar Hirlap—৮৬
Manifesto of the Socialist League—৫৬
Modern Age—২৮
Modern Review—৬৫, ১১৯, ১২১, ১৩০, ১৪৫, ১৮৩
যীশু—৪৪
রথীন্দ্রনাথ—৭২, ৭৯, ১৫১
রবীন্দ্র জীবনী (২)—৪৯, ১৪০
রবীন্দ্র জীবনী (৩)—১৪১, ১৪৬
রবীন্দ্র জীবনী (৪)—১৪৬
রবীন্দ্রনাথ-এন্ডরুজ পত্রাবলী—৯, ৫০, ১৪০
রবীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য—১৪৬
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ—১৪৫
রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা—১৪০
'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'—৯
রক্তকরবী—৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৭
রম্যাঁ রলাঁ—৯, ৩৮, ৭৬, ৮২, ৮৪
'রাজনীতির দ্বিধা'—১২
রামমোহন—৫, ৫৩
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—১০৫, ১২১, ১৪২
রাশিয়ার চিঠি—৮৮-১২৬
'রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ'—১৬২
রাঢ়-বাঁকুড়া (শারদ সংকলন)—১৬২
'রায়তের কথা'—৭১-৮২, ৮৭, ৮৯
রুসো—৫৩
'রোম্যান্টিক'—৫১
র‍্যাথবোন—৭
Rabindranath Tagore in Hungary—১৪১
'লড়াইয়ের মূল'—১৫, ১৭
লুনাচারস্কি—৯০
লেনিন—১৬, ৭৯, ১২৪, ১৭৩, ১৮৪, ১৮৯, ১৯২
লেসনি—৪৫
'লোকহিত'—১৭
Letters from Russia—৯০, ১১৯, ১২১, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৮২
Lectures and Addresses—৪৯, ৫০
Life of Lenin—১২৭
শঙ্খ ঘোষ—১৪১, ১৪২
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী—১৪০
শম্ভু মিত্র—৩৬
শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ—১৪০
শিশুতীর্থ,—৬৭

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.
Date

শুভময় ঘোষ—১৪৫
শ্যামলী—১৩৫
সজনীকান্ত দাস—১৩৪, ১৪৬
'সভ্যতার সংকট'—৯
'সমবায়-২'—২৯, ৬৯
সাখারভ—১৮৯, ১৯২
সাধনা—৫৪, ৫৬, ৬২, ১৪০
সাম্য—৫৩
'সাহিত্যে নবত্ব'—৮৭
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—১২৬
সোনার তরী—৫৮
সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ—১৪৫, ১৪৬
'সোস্যালিজ্‌ম্'—৫৬
সৌম্যেন্দ্রনাথ—৯০, ৯৬
স্ট্যালিন—১৭২, ১৭৩, ১৮৮, ১৮৯
'স্ত্রী মজুর'—৫৪
Soviet Russia—৮৯, ১৪৩
Socialism, its Growth and Outcome—৫৬
'Civilisation and Progress'—২৬
হার্ট—৮৪, ৮৫, ১৪১
হিটলার—৮৫, ১৮৯
হেমবালা সেন—১৪৬, ১৬১
হেমন্তবালা দেবী—১২৮, ১২৯
হ্যারি টিম্বার্স—৯৬
য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র—১২
য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী—১২, ৩০, ৫২, ৬২, ১২৯

P.S.V. LIBRARY, SRINIKETAN
VISVA-BHARATI
ACCESSION NO.- BG 219

~~10781A~~

VISVA-BHARATI
Palli Samgathan Vibhaga
AREA LIBRARY
Acc. No.............
Date...............

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner